# মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি

## ভূমিকা

অবিভক্ত বাংলায় তথা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের মালদহ জেলার একটা বিশিষ্টতা আছে। শুধুমাত্র ভূখন্ড হিসাবেই নয়, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও একথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ভূখন্ড বা ইতিহাস দু'দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে মালদহের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থেকে গেছে। সু-প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য ও তার অবলুপ্তি এবং গৌড় রাজ্যের অভ্যুত্থান ও তার বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাবলী দ্বারা দেখতে পাই যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের অভ্যুত্থান ও পতন। এটাও দেখতে পাই যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রশাসনে, বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে। তৎকালীণ যুগে রাজ্য অধিকার করা রাজাদের মধ্যে একটা গৌরবজনক ব্যাপার। ফলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত রাজারা রাজ্য অধিকার করে নিজেদের সৈন্যসামন্ত দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করত। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত লোকজনের সমাগম এখানে দেখতে পাই এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকেদের ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির সমাগমে মালদহ তথা প্রাচীন গৌড়ে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির একটা ধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে। মালদহ জেলার বর্ত্তমান ভাষা সংস্কৃতি যথাক্রমে প্রাচীন পালযুগ-সেনযুগ-মুসলমানী আমল ও বৃটিশযুগে এবং স্বাধীনতা পরবর্ত্তী পর্বের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বহু বিবর্ত্তণের মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান মালদহের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এত বিবর্ত্তন সত্ত্বেও মালদহ জেলার স্থানীয় ভাষা নিজস্ব খাতে বয়ে চলেছে। মালদহের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কথা বা খোট্টা ভাষা, অঞ্চল বিশেষে, নিজস্ব প্রবাহে প্রবহমান। এই সঙ্গে মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের আগমন ও বসতি - এই প্রসঙ্গের মূল বক্তব্য বিষয়, ফলে তার আলোচনাকালে দেখতে চেষ্টা করা হবে যে মৈথিলীরা প্রথমে নিজেদের ইচ্ছাই এখানে

আসে নাই। ইতিহাস সাক্ষী রেখে মৈথিল সম্প্রদায়ের আগমন সেই গৌড় রাজ্যের সময় হতেই ঘটেছে, যার প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটেছে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে গৌড় রাজের আমন্ত্রণে।

> "আণুমানিক ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে শূরবংশ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় হতেই সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখিত আকারে পাওয়া যায়। এর পূর্বের কোনও তথ্য লিখিত আকারে পাওয়া যায় নায়। সুতরাং প্রচলিত কাহিনীর উপরে কোনও প্রকার আস্থা অর্জন করা চলে না। শূরবংশীয়দের সময় হতেই গৌড়ের ঐতিহাসিক তথ্য লিপি আকারে কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। শূরবংশীয়গণের রাজত্বকালের সীমা প্রায় ৭১৪ বৎসরকাল।" [১]

আদিশূরের সময় গৌড় রাজ্যে ও পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধধর্মালম্বীদের আধিপত্য ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছিল। গৌড়ে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হলেও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নায়। আদিশূর গৌড়ে হিন্দু তথা বৈদিক ধর্ম-প্রচার করতে মনস্থ করেন। সেই সময় গৌড়ে বসবাসকারী ব্রাহ্মনেরা বৈদিক ধর্মের বেদবিধি জানতেন না। এই কারণে নিজ রাজ্যমধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রসারতার জন্য আদিশূর কম্বোজ বা কণৌজ হ'তে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। তাঁরা গৌড়ে যজ্ঞাদি ত্রি-য়াকর্ম সম্পাদন করে পুনরায় নিজ দেশে ফিরে গেলে, তাঁদেরকে নীচ যাজ্ঞী- জাতি বলে কণ্যোজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজচ্যুত করে। তৎকালে পুণ্ড্রদেশে বা গৌড়দেশে বসবাসকারীগণ ছিল নীচ জাতির লোক। এরা বেদবিধি সম্বন্ধে ছিল একেবারে অজ্ঞ ও ধর্মবিমুখ। সুতরাং এই পুণ্ড্রদেশ বা গৌড় হ'তে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণগণ সমাজচ্যুত হয়ে পুনরায় সপরিবারে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং রাজদত্ত নিষ্কর জমি লাভ করে এই গৌড়েই বসতি স্থাপন করে। অনেকের মতে আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে গৌড়ে নিয়ে আসেন। ফলশ্রুতি এই যজ্ঞের ফলেই আদিশূরের পুত্র ভূশূরের জন্ম হয়। যথা -

---

১. চক্রবর্ত্ত রজনীকান্ত - গৌড়ের ইতিহাস এস.পি.পাবলিশার্স, ২।৭ এ.সি.মার্কেট, মালদহ। ১৯৮৩, সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ.৪২

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির।।
(রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)

পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথমে পুণ্ড্রদেশে আসে। আবার কুলজী গ্রন্থ অনুসারে এই ব্রাহ্মণগণ গৌড়দেশে আসে। অবশ্য সেই সময় পুণ্ড্র ও গৌড়, যদিও পৃথক রাজ্য, তবুও ধর্মীয় দিক দিয়ে একীভূত। কারণ উভয় দেশই বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল।

কোন সময় পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম এদেশে আসে, সে বিষয়ে নানা মতভেদ দেখা যায়। কায়স্থ কৌস্তুভের মতে ৮১৪ শাকে বা ৮৯২ খৃষ্টাব্দে, দত্তবংশমালামতে ৮০৪ শাকে বা ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে, রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের মতে ৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে, বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের মতে ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে, বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকামতে ৬০৪ শাকে বা ৬৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণেরা প্রথম গৌড়ে আসে।[২]

অনুমান - "বেদ বানাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"। অর্থাৎ এই সময়ে বেদবিধি লুপ্তপ্রায় হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তদানীন্তন কনৌজ বা মিথিলা হতে গৌড়ে আসে। এরূপ হলে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের, পঞ্চব্রাহ্মণের এদেশে নিয়ে আসার সময়ের ঐক্যমত পাওয়া যায়। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে নিরূপন করিতে পারি যে ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রথম আণীত হয়েছে। আবার আদিশূরই প্রথম পঞ্চব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন এবং ঐতিহাসিক মতে আদিশূরের রাজত্বকালও এই ৭৩২ খৃষ্টাব্দেই অনুসূচিত হয়।[৩]

পঞ্চব্রাহ্মণের নামের ব্যাপারেও নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বারেন্দ্র মত অনুসারে এদের নাম যথাক্রমে - ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌরভী। রাঢ়ীয় মতে

---

২. তদেব ... পৃ.৪৩

৩. তদেব ... পৃ.৫২

এদের নাম যথাক্রমে - ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মতে এই নাম ভেদের কারণ সম্বন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাচরণ স্যান্যাল মহাশয় বলেন যে - প্রত্যেক ব্রাহ্মণের দুটি করে নাম থাকে, একটি প্রকাশ্য নাম ও অপরটি সঙ্কল্পের নাম। সংকল্পের নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত। ভট্টনারায়ন শান্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়, ছান্দড় বাৎস্যগোত্রীয় ও বেদগর্ভ সাবর্ণগোত্রীয়। আদিশূর এদের বসবাসের জন্য প্রত্যেককে একটি করে, যথাক্রমে - পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। এদের মধ্যে ভট্টনারায়নকে পক্ককোটীগ্রাম, শ্রীহর্ষকে কঙ্কগ্রাম, দক্ষকে কাম্যকোটীগ্রাম, ছান্দড়কে হরিকোটিগ্রাম এবং বেদগর্ভকে বটগ্রাম দান করেন। যদিও এই গ্রামগুলি বিস্তৃত গৌড়ের রাজ্যের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত বলে অনেকে দাবী করে থাকেন। কিন্তু, যেহেতু গৌড়রাজ আদিশূর নিজ রাজধানীতেই বৈদিক যজ্ঞাদির জন্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসে, কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে এদের বসবাসের জন্য গ্রাম দান করেছেন, নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যথাক্রমে - কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, কাম্যকোটি, হরিকোটি ও পক্ককোটি গ্রামগুলির অবস্থিতি বর্ত্তমান মালদহ জেলায় বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বটগ্রাম সম্বন্ধে প্রমানস্বরূপ একটি প্রস্তরময় ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, যার পাদদেশে ঈষৎ রূপান্তরিত দেবনাগরী অক্ষর "বটগ্রামীয়বিগ্রহকা" -এই কথাটি খোদাই করা আছে। এই মূর্ত্তিটি এত ভারী যে এটা তৎকালে দূরবর্ত্তী দেশ বা স্থান থেকে নিয়ে আসা এক দুরূহ ব্যাপার। এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বটগ্রাম মলদহের মধ্যেই ছিল। এই গ্রাম মালদহ শহরের দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমানে এর নাম বড়গাঁ।

আদিশূর আনুমানিক ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হতে ৭৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। এই সময় হতে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণগণ রাজা বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত, দীর্ঘকাল সময়ের মধ্যে মিথিলা হতে ক্রমান্বয়ে গৌড়ে তথা বর্ত্তমান মালদহে এসে বসতি স্থাপন করে।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এদের অনেকেই রাজকার্যে যোগদান করেছে। অনেকে আবার বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদের এসেছে ও ক্রমে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। একদা বর্তমান পুরাতন মালদহের নিকটে নিমাসরাইতে নদীপথে বাণিজ্যকেন্দ্র গঠিত হয়েছিল। এই নিমাসরাইতে সেই সময় বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-তরী অর্থাৎ বড় বড় বাণিজ্যিক নৌকা (চলতি কথায় ঢাকাইয়া নৌকা) এসে নোঙর করত ও নিজের দেশের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যিক দ্রব্যের আদান প্রদান ঘটত। ইহাকেই কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছিল একটা গঞ্জ। নিমাসরাই সেই সময় গঙ্গা-কালিন্দ্রী * ও মহানন্দার সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নৌকা যোগে এখানে আসার সব রকমই সুবিধা ছিল। সেই সময়ে নৌপথে পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা দেখা যায়। পারস্য, গ্রীস, হূন, কাবুল, চীন, প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেশের উৎপন্ন কৃষিজ, শিল্পজ, দ্রব্যাদির বিক্রয় করত ও এদেশের উৎপন্ন রেশম, পাট, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, ইত্যাদি এবং অন্যান্য কাঁচামাল নিজেদের দেশে কিনে নিয়ে গেছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাতায়াত করতে করতে অনেকে আবার মালদহের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রয়ে গেছে। ক্রমান্বয়ে এদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এবং প্রচলিত, ধর্মীয় অবস্থা এদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাল রেখে সংমিশ্রিত হয়েছে। পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা(দুমকা), বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, দিনাজপুর জেলা প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবেও অনেকের আগমন ঘটেছে, এই মালদায়। সঙ্গে করে নিয়ে আসা ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ও ঘটেছে ব্যাপকভাবে এবং মালদহের ভাষা ও সংস্কৃতির ঘটেছে ব্যাপক প্রসারতা।

মালদহের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেদের, ব্যাপকভাবে আগমন ঘটেছে এই জেলায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

---

* কালিন্দ্রী - এই নদী মালদহের পশ্চিমে প্রবাহিত ফুলহর নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে নিমাসরাই নামক স্থানে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। অনেকে এই নদীকে কালিন্দ্রি হিসাবে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে কালিন্দি বলতে যমুনা নদীর অববাহিকায় বুঝায়।

আগমন ঘটেছে মিথিলা থেকে মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকেদের। তদানীন্তন গৌড়ের রাজা বল্লালসেন ও আনুমানিক ১০৬৭ শাকে বা ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে মিথিলা থেকে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পরিবারকে গৌড়ে নিয়ে আসেন। তারা ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ। এদের মধ্যে সামবেদী বশিষ্ট-উপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। এদের বাসের জন্য গৌড়রাজ নিজ রাজ্যমধ্যে প্রত্যেককে ভূমিদান করেন। এরা প্রত্যেকে ভূমির স্বত্বাধিকারী হ'য়ে গৌড়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান মালদহে বসতি স্থাপন করে। অধুনা প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ের তাম্রলিপিতে এইভাবে ভূমিদান পদ্ধতির বিশদ বিবরণ জানা যায়। এটা সত্য যে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের সময় হতে ১১৪৫ খৃষ্টাব্দ বল্লালসেনের সময় পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকজন গৌড়ে এসেছে এবং এরা গৌড়ের বিভিন্ন যায়গায় বসবাস করছে। মালদহ ছাড়া অন্যান্য জেলা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন মুর্শিদাবাদের ধানিয়াগ্রাম, পলাশী(ফরাক্কা), নিশিন্দ্রা, কান্দী (মাধুনিয়া), জঙ্গীপুর, বীরভূমের দুবরাজপুর, ধলাসিং, ইত্যাদি, মানভূম তথা বর্ত্তমান পুরুলিয়ার - পুরুলিয়া, হুটমুড়া, বর্ধমানের ও মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থানে, ত্রিপুরা, কামরূপ(আসাম), বাংলাদেশের - রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, প্রভৃতিস্থানে এই সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে, বিনিময় করে অথবা অন্যভাবে মালদহে ও অন্যান্য জেলায় এসে বসবাস করছে। তবে একথা সত্য যে মিথিলায় মৈথিলীদের একত্র বাস যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনভাবে মিথিলা ছাড়া ভারতের যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা একমাত্র মালদহ জেলায় এই সম্প্রদায়ের একটা বৃহত্তর সমাজ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যত্র অর্থাৎ অন্য কোন জেলায় মৈথিলী সম্প্রদায়ের একত্রিত সমাবেশ আর নেই।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয়ের আলোচনায় জানা যায় যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ - ১৪৬০ খৃঃ পর্যন্ত। যদিও ইহা অভ্রান্ত নয়। বিদ্যাপতি জীবনী আলোচনায় দেখা যায় যে -

'মিথিলায় তখন রাজা ছিলেন পর্য্যায়ক্রমে দেবসিংহ-কীর্তিসিংহ। চতুর্দশ শতাব্দীতে দেবসিংহ-কীর্তিসিংহের রাজসভায় বিদ্যাপতি রাজকবি হিসাবে বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষরাও বিভিন্ন প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে এই পরিবার বংশানুক্রমে এই রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিদ্যাপতিও বিদ্যাগত দিক দিয়ে এই রাজবংশের বন্ধু ও দার্শনিক। কবিতো বটেই।[৪]

মিথিলার এই রাজবংশকে ওইনিবার কামেশ্বর বংশ বলা হয়। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বিদ্যাপতি এই কামেশ্বর বংশের উত্থান-পতনের দ্রষ্টাপুরুষ। এই সময়ে মিথিলারাজ্য প্রায়শই উত্তরাঞ্চলবাসী পার্বতীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হত। ইহার প্রাচীন নাম বিদেহ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে - বিদেহ মাধব পুরোহিত বহুগণ ঋষির সহিত সদানীরা অতিক্রম করে বিদেহ দেশে এসে বাস করেন। রামায়ণ ও মহাভারতে বিদেহ রাজ্যের নানা বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এখানকার প্রাচীন রাজগণের উপাধি ছিল 'জনক'। সীতার পিতা সীরধ্বজ জনক এখানকার রাজা ছিলেন। বোধহয় সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিদেহ হতে আর্য্যোপনিবেশ বিস্তৃত হয়। ভবিষ্যপুরাণে বিদেহর 'তীরভুক্তি' নামে পাওয়া যায়। বারংবার শত্রু দ্বারা আক্রমিত ও রাজ্যচ্যুত রাজপরিবার নৈমিষারণ্যে বসবাস করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে মিথিলায় ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব দেখা যায়। এমতাবস্থায় মিথিলায় বসবাসকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথিলা ত্যাগ করে সন্নিহিত অন্যান্যস্থানে গমন করে ও ভারতের বিভিন্নস্থানে বসতি স্থাপন করে। চতুর্দশ শতকের ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায় যে গৌড়রাজ্য ও পুণ্ড্ররাজ্য বৃহত্তর ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল এবং এই কারণে মালদহে মৈথিলীদের বসবাস ঘনীভূত হয়। ক্রমে মিথিলার পরেই মালদহে মৈথিলী সমাজ গড়ে উঠে। আবার মিথিলার সম্ভ্রান্ত জমিদার বা সম্পন্ন ভূস্বামী দেশত্যাগী মৈথিলীগণ মালদহে এসে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবাস শুরু করে। এদের সম্বন্ধে যদিও কোনও ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ নেই, তথাপি ব্যক্তিগত আলোচনায় ও অনুসন্ধানে জানা যায় যে প্রধানত মুসলমান

---

৪. বসু শঙ্করী প্রসাদ - মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, মুক্ত্যান্ড প্রা: লি:, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬, ১৯৬০, ২য় সংস্করণ, পৃ.১২২

অধিকারের পর ক্রমান্বয়ে বর্ত্তমান পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা (দুমকা) জেলায় জায়গীর ও জমিদারী স্বত্ব কিনে নিয়ে বসবাস শুরু করে। ইহাদের অধিকাংশই মালদহ জেলাকে বসবাসের উপযুক্ত মনে করে। মালদহ ছাড়াও অন্যান্য জায়গার জমিদারী বা জোৎদারী স্বত্ব কেনা-বেচার মাধ্যমে এই জেলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদের মধ্যে হাড়িয়াগ্রামে জয়নারায়ন মিশ্র (পরে ঝা), ফেকন চন্দ্র ঝা, রথবাড়ী গ্রামের (জংলীটোটা রথবাড়ী) রাখহরি মিশ্র (পরে রায়), মেহেরাপুর গ্রামে মধুসূদন রায়, বাগীটোলা গ্রামে বিনোদ বিহারী মিশ্র, সতীশ চন্দ্র মিশ্র, প্রভৃতি, শোভানগর গ্রামে বিশ্বম্ভর ঝা, ধরমপুরের হরিশচন্দ্র ঝা, চৌকি গ্রামে কুমুদারঞ্জন ঝা, মিলকীগ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র, একবর্ণা গ্রামে অনন্তলাল মিশ্র, আড়াইডাঙ্গা গ্রামে ভোলানাথ ঠাকুর (কুমার) ও কাশীনাথ ঠাকুর(কুমার) ও প্রবাহিত বংশধারা এবং ডুমরো (কাপাসিয়া) গ্রামে গোলকনাথ মিশ্র, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে গোলক নাথ মিশ্রের জমিদারী স্বত্ব, চাঁচোল রাজার পরেই তার স্থান ছিল। উভয়ের বন্ধুত্ব ছিল তুলনাহীন, যদিও জমিদারী স্বত্বের পরিমান ও আয় ছিল অনেক কম। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে জমিদারী বা জোৎদারীর কোনও মূল্যায়ন নেই। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করে সমস্ত রাজা, জমিদার, জোৎদার এদের বাকী সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে তাদের আর সেই আগের মত রমরমা ভাব নেই। বর্ত্তমানে এই সমস্ত রাজা-জমিদারের বংশ ধারাকে আর্থিক দৈন্যতা দূরীকরণের জন্য কোনও প্রকারের চাকুরী বা ব্যবসার উপর নির্ভরশীল হ'তে হয়েছে। তা না হলে পেটের ভাত জোটান দায় হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ মৈথিলী সম্প্রদায়ের সন্তানেরা তৎকালীন টোল বা চতুষ্পাঠীর আশ্রয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান অর্জ্জন করে যজন-যাজন-ভজনকে অবলম্বন করেই দিনাতিপাত করত। কিন্তু আর সে দিনও নেই, আর সে টোলও নেই। সংস্কৃত শিক্ষা বর্ত্তমান শিক্ষাধারায় অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। সরকার আইন প্রণয়ন করে সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠক্রম থেকে বনবাসে প্রেরণ করেছেন। এই সংস্কৃত থেকেই বাংলা

ভাষার জন্ম। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার অভাব বাংলা ভাষাকে দুর্বল করেছে। যার ফলে বাঙালী সন্তানেরা আজ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হতে চলেছে। তবুও এরই মধ্যে কিছু উদ্যোগী ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষাকে এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যদিও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আনুমানিক ৭৩২ খৃষ্টাব্দে থেকে মালদহ জেলায় মৈথিলী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের আগমন শুরু হলেও ব্যাপকভাবে-আগমন ঘটেছে মুসলমান আমলে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। এদের মধ্যে মিথিলায় যাদের জমিদারী বা জোৎদারী ছিল, তারা তা বিক্রয় করে অথবা অন্য কোনও উপায়ে অর্থের সংস্থান করে ক্রমাগতভাবে বৃহত্তর ত্রিহুতের বিভিন্ন স্থানে জমিদারী বা জোৎদারী কিনে মিথিলা ত্যাগ করে। অনুরূপভাবে তাদের সঙ্গে পৌষ্য ও আশ্রিতরাও মিথিলা ত্যাগ করে চলে আসে। যাদের একমাত্র সম্বল ছিল অধ্যাপনা, পূজা-অর্চনা, তারা এখানে এসে বিভিন্ন যায়গায় টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করে,সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করে, আবার অনেকে ব্রাহ্মণের মূল কর্ম পূজা-অর্চনাকে অবলম্বন করে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। এই সুবাদে মালদহের বিভিন্ন গ্রামে তারা যাতায়াত করে ও তাদের বাসস্থান সহ গ্রামবাসীরা তাদেরকে গ্রহন করে। এরা ঐ সমস্ত যায়গায় যজন-যাজনবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেদের জীবিকার্জন করে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত বা ঠাকুর এই নামেই পরিচিতি পায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের পেশাকে প্রসারিত করে নিজেদের অন্নসংস্থান করে চলে বা চলছে এবং এই ভাবেই ক্রমে কিছু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে পেশাগত কারণে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা চলে।

কুলজী গ্রন্থানুসারে দেখা যায় যে -

"শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত ছিল এবং এরা বাংলাদেশে প্রথম এসেছিল, গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে তাঁরই নিমন্ত্রণে বা আহ্বানে, রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রহযজ্ঞ করার জন্যে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখতে পাই - দেবল অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তানেরা গ্রহবিপ্র বা গণক নামে পরিচিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখি, গণক বা গ্রহবিপ্ররা (এবং সম্ভবত দেবল শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা) ব্রাহ্মণ সমাজ সম্মানিত ছিল না। গণক গ্রহবিপ্ররা ও পতিত বলেই গণ্য হত এবং সেই পতিত্বের কারণ বৈদিক ধর্মে তাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গননা করে দক্ষিণা গ্রহণ। এই গণকদেরই একটা শাখা অগ্রদানি ব্রাহ্মণ বলে গণ্য। কারণ তারাই প্রথমে শূদ্রকের নিকট হতে এবং শ্রাধানুষ্ঠানে দান গ্রহন করে।" [৫]

তৎকালীন বাঙ্গলা বলতে বর্তমান বঙ্গদেশকে বুঝায় না। বাঙ্গলা দেশ সুদূর বিদেহ বা মিথিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মিথিলার বর্তমান নাম দ্বারভাঙ্গাঁ। এই দ্বারভাঙ্গাঁকে 'দ্বারবঙ্গ' বলা হত। উত্তর ভারত থেকে বাঙ্গলায় আসতে হলে এটাই ছিল বাঙ্গালার প্রবেশদ্বার। বিশেষ করে মুসলমান অত্যাচারে ও আক্রমণে বিব্রত হয়ে ব্রাহ্মণেরা তৎকালীন বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে গমণ করে। স্বাধীনতা পূর্বোত্তরকালে তারা যথাক্রমে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, সাঁওতাল পরগণা(দুমকা) ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এদের অবস্থিতির প্রমাণস্বরূপ বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন অনুসারে দেখা যায় যে, গৌড়ের রাজাগণ নিজেদের রাজত্বকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণদেরকে বিভিন্ন যায়গায় গ্রামদান করেছেন ও স্বীয় রাজ্যমধ্যে তাদের বসতি দিয়েছেন। ব্রাহ্মণেরা যাতে গৌড়রাজ্যমধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করে বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রচর্চা - সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে মনযোগী হয় এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে গ্রামদান করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য

৫. রায় নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস - ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরতা ভবন ৬০, পটুয়াটোলা লেন কলি-৯, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.৩১৫

যে রাজাগণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে উত্তম-মধ্যম-অধম - শ্রেণী বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। হরিমিশ্রের কারিকায় আছে -

"উত্তমেভ্য দদৌ পূর্বং মধ্যমেভ্য স্ততো নৃপঃ।
অধমেভ্য ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎ দদৌ॥
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহু।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥"

যদিও বল্লালসেন কৃত কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি। সুতরাং হরিমিশ্রের কথা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। আবার সকল ব্রাহ্মণকে গ্রাম বা ভূমি দান করতে হলে প্রায় গোটা রাজ্যখানিই দান করতে হয়।যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যে গ্রাম পেয়েছিল, সে নিজেকে সেই গ্রামের গ্রামীন বলে পরিচয় দিত। এই গ্রামীন শব্দ থেকেই গাঁই শব্দের উৎপত্তি। গ্রামীনদের গ্রামগুলি সম্ভবত ব্রাহ্মণ প্রধান ছিল। তৎকালীন বাংলার চিত্র জানতে হবে কোন গ্রাম তা জানার প্রয়োজন। সেই গ্রামে গোত্রানুসারে ব্রাহ্মণদের বাসের কথাও জানতে হবে। নীচে গোত্র অনুসারে গ্রামগুলির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হল। -

<u>স্যাণ্ডিল্যগোত্র</u> : রুদ্র বাগচি, লাহিড়ী, সাধু বাগছি, চম্পটি, নন্দনবাটী, কামেন্দ্র, শিহরি, আড়োয়াল, বিশি, মৎশ্যাশী, চমু, সুবর্ণঘোটক, পুষান, বেগুড়ি, বন্ধ্য (হুগলী জেলার শিয়াখালা বন্দিপুর), কুলভি (বর্ধমান), কলীকুসুম বা কুসুমকলী (গুপ্তিপাড়ায়,), গড়গড়ি, ঘোষণী (মালভূমের পান্ডুা গ্রাম), দেউ (জঙ্গীপুরের ১০ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে), মাল (বর্ধমান), বড়াল (ঐ), কেশর (ঐ), কুশী (বর্তমান কুশডাঙ্গা, বর্ধমান), ঝিকো বা ঝিকোরহাট (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি।

<u>বাৎস্যগোত্র</u> : সজ্জ্বমিনী, ভীমকালী, ভটকালী, কামকালি, কুড়মুড়ি(বলিহার), ভাড়িয়াল, লক্ষ, কামরুখী (টাঙ্গাইলের নিকট), শিমলী (রাজসাহীর শিমলা),

বৌশালী, তাম্দুরী (রাজশাহীর তানোর), বৎসগ্রামী, দেউলি (বগুড়ায় করতোয়া নদীর পারে), নিদ্রালী, কুক্কুটি (খাটুগ্রাম), শ্রোতবটী, অক্ষগ্রামী, প্রভৃতি।

<u>কাশ্যপগোত্র</u> : মিত্র, ভাদুরী (ভাদুরিয়া পরগণা), করঞ্জ (পাবনার নিকট করঞ্জগ্রাম), বাণযষ্টি, কোটীগ্রামী, মোবী, বলিহারী, গোয়ালী, কীরল, বীজকুঞ্জ, সরগ্রামী, সহগ্রামী মধ্যগ্রামী, মঠগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বেলগ্রামী, চমগ্রামী, অশ্রুকোটী, সাহরী, কালি, ভীমকালি, পৌন্ড্রকালী, কালিন্দ্রী, চতুরাবন্দী, গুড়ি (মুর্শিদাবাদের গুড়গ্রাম), তৈলবাটী (বাঁকুড়ার তিলারী), ভটশালী (বর্ধমানের ভুড়ি বা ভাটকুলি), পর্কটী (পাকুড়), পীতমুন্ডি (বীরভূমের পিঠমোড়া), প্রভৃতি।

<u>সাবর্ণগোত্র</u> : সিংদিয়াড়, পাকড়ি, দধি, শৃঙ্গী, মেদড়ি, উন্ধুড়ি, ধন্ধুরী, তাড়োয়াড, সেতু, শৈগ্রামী, নেধুড়ি, কপালী, টুটুরী, পঙ্কবটী, যন্তবটী, নিকড়ি, যশোগ্রামী, শীতলী, প্রভৃতি।

<u>ভরদ্বাজগোত্র</u> : ভাদড় (মৈমনসিংহ জেলা), ঝমুটী বা ঝামাল, অতুখী, রাই, বান, শাকটি, বহাল, ক্ষেত্রগ্রামী, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, পিপুলী, শৃঙ্গ, মজোরী, গোষ্ঠালম্বী, ডিন্ডী (ডিংসাই), রাট্টী (বর্ধমান), মুখুটি, মাহুরী, প্রভৃতি।

উপরে বর্ণিত গ্রামগুলি গৌড় রাজ্যের অর্ন্তগত ছিল। রাজা বল্লালসেন ও অন্যান্যরাজগণ (গৌড়রাজগণ) বিভিন্ন গ্রামদান করে গৌড় রাজ্যে আসা ব্রাহ্মণদের পোষনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মালদহকে কেন্দ্র করে বেশীরভাগ মৈথিলী ব্রাহ্মণদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এর বিশেষ কারণ রাজা বা রাজপুরুষের সাহচর্য্য। তাছাড়া গঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলেই ব্রাহ্মণেরা বসবাস শ্রেয় বলে মনে করত। গঙ্গার পবিত্র জলের সান্নিধ্য ব্রাহ্মণদের নিকট অতিব প্রিয়। আবার রাজকীয় উপসত্ত্ব হিসাবেও হয়ত: অনেকে অনেক ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়ে সেরূপ প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় নায়। তবে এটা সত্য যে বল্লালসেনের পর গৌড়রাজ্য

বিভিন্নপ্রকার পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। মালদহে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও তাদের প্রাচীন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে। কোনও দলিল বা কাগজাদি, সকলে সঠিক ভাবে রক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য বল্লালসেনের আমলেই যে গৌড়ে মৈথিল-ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটেছে, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নি। মিথিলা থেকে ব্যাপকভাবে মৈথিলীদের আগমন ঘটেছে, প্রধানতঃ মুসলমান আক্রমনের সময় থেকে, বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক।

বিদ্যাপতি ছিলেন ভারত ইতিহাসের সংকটক্ষণের দ্রষ্টা পুরুষ। তাঁর রচিত কীর্তিলতা গ্রন্থে ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। মিথিলার কামেশ্বর বংশের সঙ্গে তাঁরা পুরুষানুক্রমে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যাপতি নিজেও রাজবংশের বন্ধু ও দার্শনিক। কবি ত বটেই, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যাপতি যদিও মৈথিলী কবি, কিন্তু তাঁর রচনা - সংস্কৃত -মৈথিলী ও অবহট্ট এই তিন ভাষায় ছিল সর্বভারতীয় প্রয়োজনে যে রচনা তা সংস্কৃতে, আঞ্চলিক প্রয়োজনে অবহট্ট ভাষায় এবং পূর্ব ভারতীয়দের প্রয়োজনে মৈথিলীতে গ্রন্থ বা কাব্য রচনা করেন। তাঁর মৈথিলীতে রচনা বাংলায় বাঙালী কবির রচনা হিসাবেই সমাদর লাভ করেছে। এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে মৈথিলী ভাষার সহিত বাংলা ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তা-ছাড়া বিদ্যাপতির লেখা মৈথিলী অক্ষর মালা তৎকালীন বাংলা অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও প্রকৃতভাবে তাঁর হাতের লেখা লিপির সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না, তবু তাঁর লিপির অক্ষরগুলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক বড়ু চন্ডীদাসের লিপির অক্ষরের প্রচুর মিল রয়েছে। সুতরাং এটা স্বীকার করতেই হবে যে মৈথিলী ভাষা ও বাংলা ভাষা একই খাতে বয়ে এসেছে। চন্ডীদাসের রচনায় কিছু শব্দ ও অক্ষর মৈথিলীর প্রচলিত শব্দ ও অক্ষরের মিল দেখা যায়, মালদহে বসবাসকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে। এর নিদর্শন পরে দেখান হবে।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী রচিত "গৌড়ের ইতিহাস" অবলম্বনে এ কথা বলা যায় যে - পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য অতীব প্রাচীন। সেই তুলনায় গৌড় আধুনিক শহর। যখন প্রথম চারিটি বেদের মধ্যে প্রথমে ঋগ্বেদের রচনা করা হয় এবং উহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়, তখন ঐ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্ররাজ্যের অধিবাসীগণ অদ্যাপি এদেশে পুণ্ড্র নামেই বাস করছে। মনুসংহিতায় (১০।৪৪) আছে, ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণদিগের অদর্শনে কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতি আচারভ্রষ্ট হয়ে পড়ে ও পুণ্ড্রেরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাভারতের নানাস্থানে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। শান্তিপর্বের ৬৫তম অধ্যায়ে পুণ্ড্রদিগকে দস্যুজীবি বলা হয়েছে, যথা -

"পৌণ্ড্রা পুলিন্দা রমঠাঃ কম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ।।"

মদ্রির্ভধশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্বে বৈ দস্যুজীবিণঃ ।।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে - বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণ হতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ডদেশের নাম হয়েছে, পুণ্ড্রগণ দস্যুজীবি, যথা -

"অন্ধান্ বঃ প্রজাভক্ষীষ্টেতি এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ

শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।
যে বিশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।।" ৭।১৮

ভাগবত মতে পুণ্ড্রগণ যযাতির পুত্র অসুরবংশীয়। রামায়নেও পুণ্ড্রদেশের উল্লেখে পাওয়া যায়। যথা -

"মগধাংশ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্তগাং অথৈবচ।
ভূমিশ্চ কোষকারানাং ভূমিশ্চ রজতাকরাং।।"

(সুন্দরকান্ড ৪০।২৩)

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ২৫তম অধ্যায়ে মহানন্দার নাম পাওয়া যায়। -

"পুনরাবর্ত্তা নন্দাংচ মহানন্দাং চ সেব্যবৈ।
নন্দনে সেব্যতে দান্তস্তু অরোভিঃ অহিংসকঃ ।।

উর্দ্ধশীং কৃত্তিকা যোগে গত্বাচৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীক ফলং লভেৎ।।"[৬]

সুতরাং এই পুণ্ড্রদেশ মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার রাজধানী বর্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত থানায় অবস্থিত। পুণ্ড্রের বর্তমান নাম পান্ডুয়া। পুণ্ড্র-রাজ্যের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। তবে মুসলমান আমলে যখন মহামারীর প্রকোপে গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন রাজধানী সাময়িকভাবে পান্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য এবং বৌদ্ধ বিহারের ইঁট-পাথর দিয়ে এই পান্ডুয়ার নববিন্যাস ঘটে। যার প্রমাণ স্বরূপ বিখ্যাত আদিনা মসজিদের প্রান্তদেশে সেই হিন্দু স্থাপত্যের ও বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতিটি বর্তমান রয়েছে। সম্ভবত গৌড় রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ যে পার্শ্বে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য ছিল। এই স্থানটির নাম বর্তমান নরহট্টা। পরে পূর্ব পাড়ে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানটির নাম পিছলী-গঙ্গারামপুর। মালদহ শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে মালদহ-রাজমহল পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত। বর্তমানে এই স্থানটিকে সকলে ৫ মাইল বলেই জানে। পিছলী গঙ্গারামপুর,গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে কালিন্দ্রী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিশে ছিল এবং গঙ্গা -কালিন্দ্রীর মিলিত ধারা কোতুয়ালীর নিকট নিমাসরাইতে মিশেছিল। (অপর পারে পুরাতন মালদহ শহর বর্তমান রয়েছে)। ফলে নদীগুলির নাব্যতাকে কেন্দ্র করে বর্তমান পুরাতন মালদহের নিকট নিমাসরাইতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। নিমাসরাইতে নদীর তীরে কুতবমিনার(বাইশগজী) ধাঁচের একটি উচ্চ গম্বুজ এখনও বর্তমান রয়েছে। বড় বড় গঞ্জে বা পোতাশ্রয়ে রাত্রিকালে আলোর সাহায্যে নৌকা তীরে নোঙর করার স্থান নির্দেশ করত। অনুরূপভাবে এই বাতিদান বা মিনার হতে নৌপথে শত্রুদের আগমন বার্তাও সূচিত হত। এতেই প্রমাণিত হয় যে সেই সময় নিমাসরাইতে জলপথ,ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

---

৬- চক্রবর্তী রজনীকান্ত - গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খন্ড পৃ. ২৮, এস.পি.পাবলিশার্স, ২১৭, এ.সি.মার্কেট মালদহ, ১৯৮৩, সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ.২১

110758
18 JAN

বল্লালসেন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গঙ্গায় তর্পণ করতে ভালবাসতেন। সেই কারণে গঙ্গা-কালিন্দ্রী তীরবর্ত্তী পিছলী-গঙ্গারামপুরে গৌড়ের রাজধানী নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত এই পিছলী গঙ্গারামপুরের রাজধানীকে রামাবতী বলা হত। কারণ এই নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্ত্তমান অমতি বা অমরতি নামের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যথা - রামাবতি - রমতী - অমরতি - অমতি। আজও সাধারণ লোকে অমতিকে অমরতি বলে থাকে।[৭] এখান থেকে (মালদহ শহরের দিকে) ৩½ মাইল বা ৫ কিঃমিঃ দূরে, বর্ত্তমান পাকা রাস্তার ধারে বল্লালসেন একটি বাগানবাড়ী তৈরী করেছিলেন। যার নাম বাগবাড়ি। বাগবাড়ীর কিঞ্চিৎ উত্তরে, বল্লালসেন দুইটি দীর্ঘিকা খনন করেন, যার একটির নাম চাম্পা দীঘি ও অপরটির নাম ভাতশালা দীঘি। দীর্ঘিকার মৃৎপুঞ্জ ভেদ করে চারিটি জলের নালা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় এই নালা দ্বারা পার্শ্বস্থ গঙ্গা থেকে সরাসরি দীঘিতে জল চলাচলের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। অনুরূপভাবে মালদহ শহরের ফুলবাড়িতে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ক্রমে গঙ্গা পশ্চিমে অর্থাৎ রাজমহলের দিকে সরে গেলে, বর্ত্তমানে ইংরেজবাজার থানার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানদ্বারা ও প্রাচীন লোকেদের নিকট থেকে জানতে পারা গেছে যে এই গড়ের প্রান্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগীরথির নিকটবর্ত্তী স্থানকে বল্লালডিটা বলে। এই গড়েরই দক্ষিণ প্রান্তে, ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত রয়েছে 'হাড়িয়াগড়' নামে একটি ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। হাড়িয়াগড় - নামকরণে প্রধানত দুটি কারণ দেখান যেতে পারে। প্রথমত গৌড় ধ্বংসের সময় গৌড়ে বসবাসকারীরা, অনেক কিছু হারিয়ে এখানে বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত গ্রামের তদানীন্তন কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি- হয়তঃ হরিনামে ছিলেন এবং গ্রামটি এখনও তার নামের স্মৃতি বহন করে রেখেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে গ্রামটি গৌড় হতে উত্তর পশ্চিম কোনে অবস্থিত বলে এই কোনকে হরিকোনা বা হরিকোন বলা হত। ক্রমে হরিকোন নামটি, গড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাড়িয়াগড় নামকরণ করা হয়েছে। এখনও প্রাচীন লোকেরা, বিশেষ করে হাড়িয়াগড়ের পূর্ব-দক্ষিনদিকের অধিবাসীরা,

৭. কুমার নিখিল - পরানপুর স্কুল ম্যাগাজিন, মালদহ ১৯৮৮

এই কোণায় মেঘ করলে 'হরিকোণায় মেঘ করেছে' - কথাটি উচ্চারণ করে। গড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ভাবে, তদানীন্তন গঙ্গার বাঁধ হিসাবে তৈরী হয়েছিল ও বাঁধের উত্তর দিকে রামাবতী রাজধানী অর্থাৎ পিছলী - গঙ্গারামপুর অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই গড়ের উপরে হাড়িয়াগড় ছাড়া মাদাপুর, মাণিকপুর, প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত রয়েছে। গ্রামগুলির অবস্থানের উচ্চতাও প্রমাণ করে যে - গ্রামগুলি গড়ের উপরেই অবস্থিত। মুসলমান রাজত্বকালে হাড়িয়াগড়ের পাশেই অবস্থিত বল্লালডিটায় প্রচুর মুসলমানদের বাস গড়ে উঠেছিল। ক্রমে বল্লালডিটা মুসলমান ডিটায় রূপান্তরিত হয়। এখনও গ্রামের ব্যবহৃত স্নানের নদীর ঘাটকে মুসলমান ঘাট বলা হয়। পরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এই স্থান ত্যাগ করে বর্ত্তমান সাৎটারী গ্রামে বসবাস করছে। মুসলমানডিটার কাছে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় রয়েছে।

গঙ্গার অববাহিকা পরিবর্ত্তণের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় রাজধানীর স্থান পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে গৌড়ের রাজধানী পিছলী গঙ্গারামপুর থেকে বর্ত্তমান রামকেলির নিকট গৌড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাই পরে লক্ষণাবতী বা লক্ষ্মৌতি নামে পরিচিত। রাজধানী ও রাজসভার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইতিহাস স্বীকার করে। ফলে বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণদের বসবাসের স্থান। গঙ্গা ক্রমাগত পশ্চিমে অর্থাৎ রাজমহলের দিকে সরে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল চড়ায় পরিণত হয়, আর এই সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি স্থাপন করে। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে ফুলবাড়িয়া, মিঞ্চী, শোভানগর, খানপুর, ধরমপুর, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। পূর্বে এই সমস্ত স্থানকে দিয়াড়া বলা হত। অবশ্য বর্ত্তমানে এই সমস্ত অঞ্চলকে দিয়াড়া বলাটা সামাজিক অন্যায়। কেননা মালদহ জেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত, মাণিকচক থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেই দিয়াড়া বলা হয়। এরই নাম ভূতনি দিয়াড়া বা ভূতনীর চর।

বল্লালসেন রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য গঙ্গার পার ধরে এক বিরাট ও লম্বা বাঁধ তৈরী করেছিলেন। এর নাম গোধরাইল বাঁধ। মালদহ শহরের দক্ষিণে, ৩৪ নং জাতীয় সড়কে, বর্ত্তমান রবীন্দ্রভবনের অনতিদূরে একটি পাকা ব্রীজ আছে, এই ব্রীজটির নাম গোধরাইল ব্রীজ বা পুল। প্রাচীনকালে গোধরাইল ব্রীজ সহ গৌড় থেকে পান্ডুয়া পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা ছিল। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত ভাতিয়া বিলে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এই নগরীর নাম ভাতিয়ানগর। গঙ্গা এককালে এই পথেই প্রবাহিত হত। সেই সময়ে মালদহ শহরের দক্ষিনে রবীন্দ্রভবনের নিকট অবস্থিত কৃষ্ণকালীতলার পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়। গঙ্গা গতিপথ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোধরাইল বিলের সৃষ্টি হয়। গঙ্গা গতি পথ পরিবর্ত্তিত করায় বিলের জমে থাকা জল দূষিত হয়ে উঠে। জল নিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় নগরী অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে। ক্রমে মহামারীর প্রকোপ দেখা যায়। ভয়ে লোকজন স্থান ত্যাগ করে। ক্রমে এই নগরী প্লাবনে(বন্যায়) ও অন্যান্য কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও বিরাট একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। এই বিস্তীর্ণ জলাশয়কে ভাতিয়ার বিল বলে। বিলের অধিকাংশই বাংলাদেশের অন্তর্গত। প্রতি বৎসর মহানন্দার জলে এই অঞ্চল বন্যাগ্রস্থ হয়।

লক্ষ্মনাবতী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে - " সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি রাজা লক্ষণসেন রামাবতীর অদূরে লক্ষণাবতী নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজমহল হইতে ২৫ মাইল ভাটীতে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গম স্থলের এই নগর, গঙ্গার তীর ধরিয়া প্রায় ১৪।১৫ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। সেন আমলের লক্ষণাবতীকে আশ্রয় করিয়া তুর্কী সুলতানদের গৌড় লক্ষণৌতি হইতে রাজধানী কিছুদিন পর পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়, তবু লক্ষণৌতির খ্যাতি ও মর্য্যাদা হুমায়ুণ - আকবরের আমল পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। মুঘলেরা ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন জন্নতাবাদ। গঙ্গা ও মহানন্দার খাত পরিবর্ত্তনের ফলে লক্ষণৌতি অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে পরিণত হয় এবং ষোড়শ শতকের শেষাশেষি নাগাদ নগরী পরিত্যক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে বাংলার রাজধানী টান্ডায় এবং সর্বশেষ রাজমহলে স্থানান্তরিত

হয়।" [৮]

মহামারীর প্রকোপে প্রচুর মানুষ মারা যায়, এমনকি শব সৎকার করার লোক পাওয়াও হয়ে উঠে দুষ্কর। লোকজন প্রাণের ভয়ে মৃতদেহ সহ বসতবাড়ী ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। ব্যাপক সংখ্যায় লোকজন গঙ্গার চড়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে ও নিজেরাই সালিসী করে স্থানীয় জমি যায়গার ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। পরে ঐ সমস্ত জায়গায় বাড়ীঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করে। যদিও এই প্রকারে ভোগ দখলী জমি-জায়গার প্রাথমিক ইতিহাস, অনেক অনুসন্ধানেও, প্রামানিক তথ্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্ত্তীকালে জরিপী নিয়ম অনুসারে পত্তনি পাওয়া সম্পত্তির হিসাব পাওয়া যায়। গঙ্গার সরে যাওয়া অংশে অথবা দিয়াড়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে, আর প্রমান এখন পর্যন্তও পাওয়া যায়। অমৃতির পরেই জমিগুলি বালুকাময়। যদিও প্রতি বৎসর বন্যায় প্রচুর পরিমানে বয়ে আসা পলিমাটীর প্রভাবে জমিগুলির উর্বরা শক্তি বর্ত্তমান। কিন্তু অল্পমাত্র গর্ত্ত করলেই, নীচে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। এই বালি, গঙ্গার চড়ে যে বালু দেখা যায়, তার সমতুল। তথ্যের অনুসন্ধানে শোভানগরে পৌছাই ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনাকালে শোভানগর গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও কালিন্দ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পিনাকীরঞ্জন ঝা (পিন্টুদা)-এর নিকট থেকে জানতে পারি যে এই গ্রামে একজন বাড়ীর ভিত খুঁড়তে গিয়ে মাটির নীচ থেকে একটি ভাঙ্গা নৌকার পাটাতন বা নৌকার ভাঙ্গা অংশ বিশেষ পাওয়া যায়। কারণ-স্বরূপ

---

৮. টান্ডা - টান্ডা বা টাঁড়া নগরীর অনতিদূরে বর্ত্তমান জালুয়াপাথাল নামক গ্রামের নিকট অবস্থিত। স্থানটি পাগলা নদীর বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। ~~এখানে এক ফকিরের নির্দেশে~~ এখানে এক ফকিরের নির্দেশে, এখানকার ময়রা একপ্রকার সুস্বাদু মিষ্টি তৈরী করত। এই মিষ্টির নাম খাজা। টান্ডায় তৈরী হত বলেই টান্ডার বা টাঁড়ার খাজা নামে খ্যাত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মালদহের কিছু ময়রা এই ধরনের খাজা তৈরী করত। বর্ত্তমানে হয়ত : এই সুস্বাদু খাজা তৈরীর ময়রা না থাকায় বা নূতন প্রজন্মের কোনও ময়রা খাজা তৈরীর অভিজ্ঞতা অর্জন না করায়, এই খাজার দর্শন দুর্লভ।

বলা যায় যে গঙ্গায় বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক নৌকা ডুবে যেত ও এ-যে যে বালি চাপা পড়েছিল, এটা তারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।[১]

মালদহে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - চক্রবর্তী (চট্টোপাধ্যায়), ভট্টাচার্য্য, ব্যানার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়), গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়), ঘোষ, বোস, মৈত্র, মিত্র, প্রভৃতি। মৈথিলী সম্প্রদায় ছাড়া, এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা মালদহের বরেন্দ্র ভূমির বাসিন্দা এবং এদেরকে বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলা হয়। অবশ্য এদের মধ্যে কিছু কায়স্থ (কায়েত)ও রয়েছে। কিন্তু আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মৈথিলী সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মালদহের বিভিন্ন প্রত্যন্তে বা গ্রামে বসবাস করে আসছে। আবার বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার হয়ে তারা স্থানান্তরে বসতি স্থাপন করে চলেছে। আর একধরনের মানসিকতা সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে জেগে উঠেছে। সেটা হল শহর কেন্দ্রিক বসবাসের ইচ্ছা। অবশ্য এই মানসিকতা বিভিন্ন কারণে ঘটে চলেছে। কেহ চাকুরীক্ষেত্রে, কেহ ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে, আবার অনেক বর্তমানে উদ্ভূত নীচুমানের রাজনৈতিক অস্থিরতা। ফলে অনেক শান্তিকামী মানুষ গ্রামের শান্তভাব ও স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করে শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে চলে আসছে, বসবাসের জন্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই মানসিকতা দানা বেঁধেছে, আর বিভিন্ন গ্রামে ছিটিয়ে থাকা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই ভাব খুব বেশী পরিমাণে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে গ্রামের সমস্ত কিছু বিক্রয় করে চলে আসছে, আবার অনেকে গ্রামের বাসস্থানকে অক্ষত রেখেও, শহরে বাড়ী তৈরী করে অথবা কিনে অথবা ভাড়ায় বসবাসের চেষ্টায় রত রয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে অনেকটাই নিজেদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার কারণে। কারণ, বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শে, গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান খুব নীচু হয়ে পড়েছে এবং অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষার আশ্রয়স্থল হয়ে

---

১. শোভানগর গ্রামের ও কালিন্দ্রী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী পিনাকী ঝা মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় এই তথ্য পাওয়া গেছে।

পড়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষার এমনকি সাধারণ শিক্ষারও অভাব আজকাল বিস্তার লাভ করতে চলেছে - গ্রাম মালদহে। এরই মধ্যে কতক মৈথিলী প্রধান গ্রাম স্বীয় মর্য্যাদায় নিজ নিজ গ্রামে এগিয়ে চলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নিজেদেরকে প্রতিপালনোপযোগী করে তুলতে। বিভিন্ন গ্রাম মালদহ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, আজকাল তৈরী সড়ক ও যানবাহনের মাধ্যমে। গ্রাম ও শহরের জীবন ধারার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। গ্রামের জীবন ধারায় আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা যতটা সহজ, শহর জীবনে ততটাই অসম্ভব। দৈনিক নিত্যনূতন বিলাসিতার বহর বয়ে চলেছে শহর জীবনে। তাই অল্প আয়ের পরিবার, বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও, গ্রাম জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার পূজা অনুষ্ঠান বা আচার আচরণে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নদীর প্রভাব অত্যন্ত বেশীভাবে দেখা যায়। ফলে নদীর তীরবর্ত্তী স্থানেই - এই সম্প্রদায়ের বসতি দেখা যায়। এককালে সমস্ত গ্রামের অবস্থিতি নদীর তীরেই ছিল, কিন্তু ক্রমাগতভাবে নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে অনেক গ্রামকেই নদীতীর থেকে দূরে দেখা যায়।

শহর জীবনে মৈথিলীদের নিজস্ব ভাবধারা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এর মূল কারণ লোকলজ্জা, লোকভয় ও শহরে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ব্রত-পার্ব্বন, লৌকিকতা, পার-লৌকিকতার মধ্যে মৈথিল সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্য। এই সমস্ত কারণেই মৈথিলীরা নদী প্রভাবিত গ্রাম জীবনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট।

একটি মাত্র মহকুমা শাসিত মালদহ জেলার প্রশাসনিক কার্য্যালয় হল - ইংরেজবাজার। এই জেলায় বর্ত্তমানে ১১ টি থানা রয়েছে - ইংলিশবাজার, মালদহ, গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মাণিকচক, রতুয়া, খরবা(চাঁচোল) ও হরিশ্চন্দ্রপুর। এ-ছাড়া দুটি - উপথানা, যথা মোথাবাড়ি ও গোলাপগঞ্জ। আঞ্চলিক অধিবাসীদের মতে উপ-থানা গুলি থানা হিসাবেই কাজ করে চলেছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে বিভিন্ন থানার

গ্রামগুলিতে প্রায় ১৬০০১ জন মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করছে। নীচে থানাগত-ভাবে এই সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান দেওয়া হল। যথা -

| ক্রমিক নং | থানা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | ইংলিশবাজার | ২৮৬৫ জন |
| ২ | কালিয়াচক | ৩৭০৭ জন |
| ৩ | মালদহ | ১১০৭ জন |
| ৪ | গাজোল | ২০১ জন |
| ৫ | বামনগোলা | ৫৭ জন |
| ৬ | হবিবপুর | ২৭ জন |
| ৭ | বৈষ্ণবনগর | ৬১ জন |
| ৮ | মাণিকচক | ২২৫৩ জন |
| ৯ | রতুয়া | ৫০২৫ জন |
| ১০ | খরবা (চাঁচোল) | ১৫৭ জন |
| ১১ | হরিশ্চন্দ্রপুর | ৪১ জন |
| | মোট লোকসংখ্যা | ১৬, ০০১ জন |

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পুরুষ ৩৫% ও মহিলা ১৭%

উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে থানাগত ভাবে মৈথিলী সম্প্রদায়ের বসবাসের দিক দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে রতুয়া থানা। গ্রামগুলি হল - আড়াইডাঙ্গা, একবর্ণা, সিয়লা, গোধরজনা, বাহারাল, দেবীপুর, কটাহাদিয়াড়া, কাহালা ও পুখুরিয়া, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কালিয়াচক থানা - গ্রামগুলি হল - রথবাড়ি, দুর্লভপুর,

বালুচর, বাগীটোলা, মেহেরাপুর, শিবনারায়নপুর, রামেশ্বরপুর, মজমপুর, আলিনগর, শিলমপুর, খাসমহাল, পঞ্চানন্দপুর, কাঁঠালবাড়ী, ইত্যাদি; তৃতীয় স্থানে আছে ইংলিশবাজার থানা, গ্রামগুলি হল - হাড়িয়াগড়, শোভানগর, মিল্কী, বারঘরিয়া, নঘরিয়া, পাঁচগাছি, ফুলবাড়িয়া, মাদাপুর, মহদিপুর ও মালদহ শহরের মধ্যে অবস্থিত, মকদুমপুর, পিরোজপুর, বিনয়সরকার রোড, ফুলবাড়ি, পুড়াটুলি, মাধবনগর, প্রান্তপল্লী, ইত্যাদি; চতুর্থ স্থানে রয়েছে মাণিকচক থানা, গ্রামগুলি হল - ধরমপুর, খানপুর, রঘুনাথপুর, চৌকি, শ্যামলালপাড়া, নাজিরপুর, লালবথানী, মথুরাপুর, কামালপুর (মাণিকচক), বিষণপুর, ইত্যাদি, এছাড়া বাকী অন্যান্য থানা বসতি গ্রামগুলি হল - ডুমরো, চাঁচোল, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভালুকা, গাজোল, আলাল, ঋষিপুর, পাঁচপাড়া, আইহো, মুচিয়া, মঙ্গলবাড়ী, বামনগোলা, বৈষ্ণবনগর ইত্যাদি। শিক্ষাগত মানে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধা ও শিশু ছাড়া বাকী সকলেই অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত অর্থাৎ কেও নিরক্ষর নেই।

মালদহের মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পদবী পাওয়া যায়। যথা - ঝা, মিশ্র, রায়, চৌধুরী, ওঝা, পাঠক, ঠাকুর, কুমার, ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অথবা অন্যান্য কারণে অনেকে পিতৃ-পিতামহের প্রচলিত পদবী পরিত্যাগ করে নূতন পদবী গ্রহন করেছে, যেমন - চক্রবর্তী, উপাধ্যায়, ইত্যাদি এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা চলতে পারে বলে সহজেই অনুমান করা চলে। সমাজের বুকে নূতন কোনও চেতনার প্রবেশ ঘটলে, অনেক সময়েই তার ফল মারাত্মক হয়ে উঠে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে হয়তঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মে মালদহে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান করা দুরূহ হয়ে পড়বে, এরূপ আশংকা করা অমূলক হবে না।

এছাড়া মালদহে বসবাসকারী গোস্বামী সম্প্রদায়ও পূর্বে মৈথিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এরা দীক্ষাদান কর্মের দ্বারা নিজেদেরকে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদের শিষ্য সম্প্রদায়

সমাজের নীচু সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা নিজেদের গুরুকে ভগবানের অবতার রূপে মানত এবং গুরুকে 'গোঁসাই' আখ্যাদানে সম্বোধন করত। ফলে এরা ক্রমে গোঁসাই থেকেই গোস্বামী - এই উপাধি গ্রহন করে বসবাস করছে। মালদহে মৈথিলীদের মধ্যে খাঁ উপাধি পাওয়া যায় না (দ্বারভাঙ্গায় রয়েছে)। এমনও হতে পারে যে একসময় কোনও পরিবারের খাঁ উপাধি ছিল। ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে বর্ত্তমানে অন্য পদবীতে নিজেদের পরিচয় বহন করে চলেছে। কারণ ইতিহাসে পরাগল খাঁ নামক ব্যক্তির সন্ধান এই গৌড়েই পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে আরও দেখতে পাই যে অনেকে নিজেদের মূল পদবীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে রাজা-নবাব বা ইংরেজের দেওয়া উপাধিকেই বহন করে চলেছে। যেমন - রায় উপাধি ব্যবহারকারীরা পূর্বে মিশ্র ছিল। রথবাড়ী, রামেশ্বরপুর, মেহেরাপুর, প্রভৃতি স্থানের মৈথিলীরা রায় উপাধি ব্যবহার করছে। কিন্তু এদের প্রাচীন উপাধি ছিল মিশ্র। এদের মধ্যে রামেশ্বরপুরের মৈথিলীরা পাওয়া রায় উপাধি ত্যাগ করে পুনরায় নিজেদের প্রাচীন উপাধি 'মিশ্র' গ্রহণ করেছে। আড়াইডাঙ্গার মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ঠাকুর উপাধিযুক্ত পরিবারের বংশধারা। বহুকাল পূর্বে রাজপ্রদত্ত 'কুমার' উপাধি এখন পর্যন্ত তারা ব্যবহার করছে। অনুসন্ধানকালে আড়াইডাঙ্গা গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃদয়কুমারের কাছে সংরক্ষিত কুমার পরিবারের বংশপঞ্জি তৎপুত্র অরুণকুমারের সৌজন্যে দেখার সৌভাগ্য হয় ও অনুমতি লাভ করে লিপিবদ্ধ করি (কুলপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। প্রদত্ত কুলপঞ্জী অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী হতে কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীকর ঠাকুরের ষষ্ঠপুরুষ সন্তোষ ঠাকুরের পুত্রদ্বয় কাশীনাথ ঠাকুর ও ভোলানাথ ঠাকুর এই গ্রামে প্রথমে আসেন। মিথিলার রাজার কাছ থেকে এই পরিবার 'কুমার' - উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমানে কুমার পদবীই মূল পদবী হিসাবে বিশেষ পরিচিত। এই বংশের কুলপঞ্জি প্রমাণ করে যে গ্রামের মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাশীনাথ ও ভোলানাথের বংশধারাই প্রধান। এছাড়া গ্রামে ঝা-মিশ্র প্রভৃতি উপাধিধারী এই সম্প্রদায়ের কিছু বসবাসকারীও রয়েছে এবং তারা যে এই বংশ ধারার নয়, উপাধি দ্বারাই তা সূচিত হয়।

আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামে প্রাপ্ত কুলজী-অনুসারে জানতে পারা যাচ্ছে যে কাশীনাথ ও ভোলানাথের পিতার নাম সন্তোষ ঠাকুর। স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি-দের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে এই বংশের পূর্বপুরুষ শিবাই ঠাকুর দ্বারভাঙ্গা রাজ পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। রাজা নিজের গুরুর সুচ্ছন্দ্যের জন্য যধুবণীতে কিছু জমিদারী স্বত্ব দান করেন ও কুমার পদবী দান করেন। কিন্তু প্রাপ্ত কুলজী অনুসারে শিবাই ঠাকুরের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, আবার আরও একটা বিভ্রান্তি দেখা যায় যে কুলজীতে কাশীনাথ ঠাকুর ও ভোলানাথ ঠাকুর অর্থাৎ ঠাকুর পদবী পরবর্ত্তীতে কুমার লেখা রয়েছে। তবে কি এই কুমার পদবী অন্যভাবে গ্রহণ করে পূর্বপুরুষের নামেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? আবার এমনও হতে পারে যে সে সময় পর্য্যন্ত কুমার পদবী বিশেষ ব্যবহার করা হত না। আর শিবাই ঠাকুর বলে কুলজীতে কোনও নাম নেই, এমনও হতে পারে যে কোনও একজনের পারিবারিক পোষাকী নামের বদলে আত্মীয়দের দেওয়া নাম শিবাই থাকায় সকলে শিবাই ঠাকুর বলেই জানত। আবার শিবের পূজক হিসাবেও শিবাই নামটি প্রচলিত থাকতে পারে। সে যাই হউক, পিতার মৃত্যুর পর কাশীনাথ ও ভোলানাথ বিধবা মায়ের সঙ্গে যধুবনী ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষনে, তৎকালে পূর্ণিয়ার অর্ন্তগত আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামে এসে উপস্থিত হল। গ্রামের গোয়ালা সম্প্রদায় এই দুই ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণ যুবকদেরকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে। নিজেদের বুধিমত্তা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের নবাব সরফরাজ খাঁর আনুকুল্যে এই অঞ্চলের কাজী (বিচারক) পদে নিযুক্ত হয়ে কাজ করেন। সেই সময়ে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি তাঁদের অধীনে আসে ও তার মালিকানা হস্তগত হয়। প্রমাণ যে এঁরা পরবর্ত্তী নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় পর্য্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা সবিশেষ জানা যায় নি। অনুমান এবং ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী অনুসারে তাঁদের আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামে আগমন ঘটে প্রায় সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে। সুদীর্ঘ ২৫০ (আড়াইশত) বৎসর যাবৎ বংশানুক্রমে বর্ত্তমানে এই বংশের

ষষ্ঠপুরুষ এখানে বসবাস করছে। এছাড়া আরও কিছু বংশধারার মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা এখানে বসবাস করছে, যেমন জগত্তারণ ঝা ও তার বংশধারা। বিভিন্ন বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণদের বাস থাকলেও এককভাবে ও মিলেমিশে, এই গ্রামের সম্প্রদায় সংখ্যা বাড়িয়ে রেখেছে।

এই গ্রামের কিছু পরিবার, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে অন্যত্র বসবাস করছে। সংখ্যা বৃদ্ধির চাপে প্রায় প্রত্যেকটা পরিবার খণ্ডিত। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, বিভিন্ন লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারি যে, নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও তার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। পরিবারগত সমস্যার সমাধান নিজেরাই সম্পন্ন করে নেয়। বংশ পরম্পরাগতভাবে প্রত্যেক পরিবার কিছু কিছু সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, উপরন্তু নিজেদের আয়ের দ্বারা আরও কিছু সম্পত্তির সংযোজন ঘটিয়ে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের পথ সুগম করে চলেছে। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র সম্পত্তির উপর নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ও পেশাগতভাবে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়ে ভদ্রভাবে দিনাতিপাত করে চলেছে। পার্শ্ববর্ত্তী কালিন্দ্রী নদীর শীতল বায়ু গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে চলেছে। উপরন্তু গ্রামটি অন্যান্য প্রকারেও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কারণ এখানে আছে - উচ্চবিদ্যালয়, হাসপাতাল, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আঞ্চলিক উন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, ব্যাঙ্ক, বাজার, শহরের সঙ্গে যোগাযোগের সুষ্ঠু মাধ্যম হিসাবে নিয়মিত বাস চলাচল, পাকা রাস্তা, প্রভৃতি। বর্ত্তমানে এই গ্রামে মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের বেশী। গ্রামের প্রাচীন বসতি কালিন্দ্রী নদীর অপর পারে ছিল। নদীর করাল গ্রাসে সেই বসতিপূর্ণ স্থান অবলুপ্ত হয়েছে। পরে আড়াইডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করে এখন পর্য্যন্ত বসবাস করছে। গ্রামটি শিক্ষায় ও অন্যান্য ব্যাপারে সব দিক দিয়ে সমাজের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আরও একটি মৈথিলী প্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রামটির নাম বাঙ্গীটোলা। মালদহ জেলার পশ্চিম প্রান্তে, কালিয়াচক থানার অন্তর্গত এবং গঙ্গানদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এখানে ঝা, মিশ্র, ঠাকুর, উপাধ্যায়, ওঝা, কুমার, প্রভৃতি পদবীধারী মৈথিলীরা একটা নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় বসবাস করছে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত দপ্তর, হাট, বাজার, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, প্রভৃতির সু-ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের সঙ্গে তথা অন্যান্য স্থানের সঙ্গে পাকা সড়ক পথে ও সুষ্ঠু বাস-ট্যাক্সি চলাচলে যোগাযোগের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে এখানকার লোকজন শহরে বাস না করেও শহরের সমস্ত প্রকার সুবিধাদি উপভোগ করছে। গঙ্গা নদীর উন্মুক্ত বায়ু ও গ্রামের প্রায় পাশ দিয়েই বয়ে চলা ভাগীরথী নদীর বায়ু প্রবাহ এই গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার দিক দিয়েও গ্রামটি সমধিক উন্নত। এখানকার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ। কোনও দুন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও পারিবারিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যথেষ্ট মতৈক্য দেখা যায়। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত - শ্রীশ্রী যুক্তেশ্বরী মায়ের মন্দির অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা বেষ্টিত। অনুসন্ধানে জানা যায় যে গ্রামটিতে লোকবসতি শুরু হওয়ার আগে স্থানটি গঙ্গার পারে শ্মশান হিসাবেই ব্যবহৃত হত। সেই সময় ডোমজাতীয় ও শবর জাতীয় কিছু লোক এখানে বসবাস করত। তখন জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) থেকে একজন সাধক এখানে এসে যুক্তেশ্বরী মায়ের সেবা ও পূজা করতেন। ~~সেই স্থানেই, বর্ত্তমান যুক্তেশ্বরী মায়ের সেবা ও পূজা করতেন।~~ সেই স্থানেই, বর্ত্তমান যুক্তেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রতি বৎসর শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও পূজা উৎসব পালিত হচ্ছে। স্থানটি বালুকাময় থাকায় প্রচুর বাঙ্গী জাতীয় একপ্রকার রসাল ফলের চাষ হত। হয়ত এই কারণেই বাঙ্গী (একপ্রকার রসাল ফল) + টোলা (পাড়া) = বাঙ্গীটোলা নামের সৃষ্টি হয়েছে।

আরও একটি গ্রাম সম্মুখে আলোচনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। গ্রামটির নাম হাড়িয়াগড়। ইংলিশবাজার থানার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গ্রামটি ভাগীরথী নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। গ্রাম হিসাবে হাড়িয়াগড় গ্রামটি খুব একটা উন্নত না হলেও, তথ্যানুসন্ধানে গ্রামটির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য জানতে পারা গেছে। গ্রামটির দক্ষিণে প্রবাহিতা ভাগীরথী নদী এবং উত্তরে অবস্থিত সুদীর্ঘ প্রাচীরের ন্যায় উঁচু টিলা বা গড়। প্রাচীনদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে যে গ্রামের ঠিক দক্ষিণে উঁচু ভিটাকে বল্লালভিটা বলে (অবশ্য এখন আর কেও বলে না)। গঙ্গা পিছলী-গঙ্গারামপুর থেকে দিক পরিবর্ত্তন করে দূরে সরে গেলে, বন্যা প্রতিরোধের জন্য গঙ্গার পাড় ঘেঁসে সুদীর্ঘ উঁচু বাঁধ তৈরী করা হয়। এই বাঁধ- হাড়িয়াগড় গ্রামের পার্শ্বে অবস্থিত ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে এখানেই - গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে এই বাঁধের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে হাড়িয়াগড়, যাদাপুর, মাণিকপুর, প্রভৃতি গ্রাম গড়ে উঠেছে। রাজা বল্লালসেন গঙ্গা স্নান করতে খুব ভাল বাসতেন। সেই কারণে হাড়িয়াগড়ের পার্শ্বেই উঁচু বাঁধের উপর একটা কাছারী বাড়ী স্থাপন করেন ও মাঝে মধ্যে এসে বাস করতেন। যে কোনও কারণেই হউক, পরে যায়গাটি পরিত্যক্ত হয়। এই উঁচু গড়ের ক্ষয়িষ্ণু অংশ এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। গড়ের একেবারে শেষ সীমানায়, বর্ত্তমান ভাগীরথী নদীর তীরে গড়ে ওঠে হাড়িয়াগড় গ্রামটি। গ্রামের বাস্তুভিটাগুলি গড় কেটে প্রস্তুত হয়েছে বলেই উঁচু এবং গ্রামটি দেখলেই সহজে অনুমান করা যায় যে - কোনও উঁচু স্থানকে কেন্দ্র করেই গ্রাম গড়ে উঠেছে। আশপাশের গ্রাম-গুলি সেই তুলনায় নীচু। গ্রামের লোকেদের খাবার অভাব বিশেষ ছিল না কিন্তু শিক্ষার অভাবে ভুগছিল। সেই সময়ে ২।১ জন ছাড়া শিক্ষার উচ্চতম মান ছিল মাইনর বা ষষ্ঠশ্রেণীর। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে এই গ্রামে শিক্ষার আলো খুব মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালের পর থেকেই গ্রামটি শিক্ষার আলো পেতে থাকে। বর্ত্তমানে গ্রামে নিম্নতম শিক্ষার মান মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত। উচ্চশিক্ষার দিকেও এগিয়ে চলার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বর্ত্তমানে স্নাতোকত্তর উপাধি প্রাপ্ত একাধিক

ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আরও একটা প্রয়োজনীয় তথ্য এই যে একজন প্রসিদ্ধ মণিষী ও সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী শদাধির(রমণী) মহারাজ এই গ্রামের পূর্ব প্রান্তে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় (দেওয়ালীতে) কালীপূজা করা হয়। মূর্ত্তির উচ্চতা ১-½ হাত এবং গ্রামের যুবক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ট্রাস্ট গঠন করে পূজা কার্য সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে গ্রামে রাজনৈতিক হীনমন্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। হীনমন্যতার পরিণাম স্বরূপ প্রবীর ঝা নিহত ও গ্রামের অনেক শান্তিকামী ব্যক্তিরা গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করছে। ফলে গ্রামের বহিঃপ্রকাশ অবরুদ্ধ হয়েছে ও উন্নতির পদক্ষেপে পশ্চাদগামী। অল্প ২।১ মাস হল, পঞ্চায়েত দপ্তরের আনুকূল্যে ভাগলপুর ঘাটে পাকা সেতু তৈরী হওয়ায় - অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা সমাধান হয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবিকা নির্ব্বাহ বিভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। খাতগুলি আলোচনাকালে দেখা যায় যে গৃহস্থি (চাষাবাদ), চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, যজন-যাজন-ভজন, ইত্যাদি। প্রথমতঃ মৈথিলীগণ মালদহে এসে দু'টি প্রথাকে গ্রহণ করে - (১) জমিদারী বা জোৎদারী, (২) যজন-যাজন-ভজন। কিন্তু ক্রমে জমিদারীর ও জোৎদারীর বিলোপ ঘটে। জমির উর্দ্ধতন সীমা পরিবার প্রতি সীমিত করে দেওয়া হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে অধিকাংশ পরিবার প্রায় নিরন্ন হতে চলেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় নিজেদেরকে বিভিন্ন প্রকার আয়ের পথে নিযুক্ত করা। সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে, বিভিন্ন প্রকার কর্মে নিয়োজনের জন্য একটা ব্যাপক উদ্দীপনাও দেখা দেয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পূর্বে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটা শ্রেণী বিভাগ ছিল। এক শ্রেণী প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। আর এক শ্রেণী পুরোহিত বৃত্তি অবলম্বন করে ও পূর্বোক্ত শ্রেণীর আড্ডাখানার মোসাহেব হয়ে দিনাতিপাত করত। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর

পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি আস্থাশীল ছিল। কালের পরিবর্তনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী উভয়েই আজ একাকার হয়ে পড়েছে। শিক্ষা গ্রহণ করে আজ উভয় শ্রেণীর বংশধরগণ বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী বা অন্য উপায় অবলম্বন করে, নিজেদেরকে প্রতিপালন করে চলেছে। অনেকক্ষেত্রে পূর্বের অবহেলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই, বর্তমানে প্রথম শ্রেণীকেই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, বিভিন্ন প্রকারে।

এককালে সংস্কৃতই ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শিক্ষাধারার প্রধান অবলম্বন। এই কারণেই সমস্ত সম্পন্ন ও মৈথিলী অধ্যুষিত গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠীর প্রচলন ছিল। এমনকি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করেও এই চতুষ্পাঠীর প্রচলন ছিল। ফলে চতুষ্পাঠীগুলি মোথাবাড়ী, আড়াইডাঙ্গা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ইংলিশবাজার, প্রভৃতি যায়গায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে। ক্রমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে চতুষ্পাঠীগুলি অবলুপ্তির পথে। বর্তমানেও ইংরেজবাজারের 'বিশ্বনাথ' চতুষ্পাঠী কোনও প্রকারে ধুঁকিয়ে, এই সংস্কৃত শিক্ষাধারাকে আঁকড়ে রেখেছে। সংস্কৃত শিক্ষার ধারা অবলুপ্তির কারণস্বরূপ দেখা যায় যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্য চাকুরীর প্রতি সকলের অসাধারণ ঝোঁক। এর সূত্রপাত ঘটে বিগত পঞ্চদশ-ষোড়শ খৃষ্টাব্দ থেকেই। হিন্দু রাজত্বকালে যেমন সংস্কৃতের প্রতি সকলের আগ্রহ ছিল ও প্রসার ছিল মুসলমান রাজত্বকালে তা প্রশমিত হয়। মুসলমান আমলে রাজকার্যে নিয়োগ পেতে হলে প্রয়োজন হল, রাজকীয় ভাষা হিসাবে ফার্সি ভাষার জ্ঞান। ফলে দেশে ফার্সি শেখার জন্য বিভিন্ন স্থানে মক্তবের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারেও তখন সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সি-ভাষা শেখার জন্য একটা হিড়িক পড়ে যায়। অনেকে বাড়ীতে মৌলবী নিযুক্ত করে সন্তানদের ফার্সি ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এর ফলস্বরূপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি যে ঝোঁক ছিল তা ফার্সি ভাষা শেখার প্রতি বেড়ে গেল, ফলে ফার্সি ভাষার পাল্লা

ভারী হয়ে উঠল। আবার সপ্তদশ অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে দেশ যখন ইংরেজ অধিকারে আসে, তখন রাজকীয় ভাষা হয় ইংরাজী। ফার্সি ভাষার রমরমা অবলুপ্ত হতে লাগল ও তার স্থান দখল করল ইংরাজী ভাষা। সুতরাং আবার দেখা গেল পটপরিবর্তন। প্রত্যেক পরিবারে ইংরাজী ভাষা শেখার হিড়িক দেখা গেল। মক্তব বা মৌলবীদের রমরমার অবসান ঘটল। এদিকে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান অর্জন না করলে পর ইংরাজদের আমলে কোন সরকারী কাজে যোগদান করতে পারছে না। ফলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল ও এই ভাষা শেখার ঝোঁক সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রত্যেক সামর্থ ব্যক্তি মাত্রই নিজ নিজ সন্তানকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত করার মানসে প্রাচীন শিক্ষাধারা(সংস্কৃত ও ফার্সি)কে বিসর্জন দিয়ে নূতনের প্রতি এগিয়ে চলে। কিন্তু মৈথিলী সমাজের বৃহত্তম অংশ ইংরেজদের চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহারে বিরূপ মনোভাব পোষন করে। উপরন্তু ইংরেজদেরকে ম্লেচ্ছরূপেই পরিগণিত করে। ইংল্যান্ডকে ম্লেচ্ছ দেশ হিসাবে গণ্য করে। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের মতে ইংরেজদের প্রচলিত ইংরাজী শিক্ষাকে ম্লেচ্ছ শিক্ষা বলেই গ্রহণ করতে দ্বিধা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে শোভানগর নিবাসী কালীপদ ঝা মহাশয়, সামাজিক সমস্ত আপত্তিকে অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে ইংল্যান্ডে(বিলাতে) যান এবং ইংরাজী সহ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসেন। মালদহের মৈথিলী সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করে রাখে। তাঁর মূল পদবী ছিল 'ঝা' কিন্তু তাঁকে সকলে সাহেব বলে নির্দিষ্ট করে। অবশ্য এই পরিস্থিতি খুব বেশী দিন চলেনি। সামাজিক বয়কট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মালদহের মৈথিল সম্প্রদায়কে (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে) ঢালাও নিমন্ত্রন করেন ও এই সমাজের রুচিমত আহারের ঢালাও ব্যবস্থা করেন। আহার বিলাসী বা ভোজনপটু মৈথিলী সম্প্রদায় সু-খাদ্যের প্রলোভনে সামাজিক বয়কট তুলে নেয়। এই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব তাও দূরীভূত হয়।

প্রত্যেক পরিবারের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সন্তানদের ইংরাজী শিক্ষা-লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলস্বরূপ এই সম্প্রদায়ের অনেকে উচ্চশিক্ষিত হয়ে দেশের বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন। আধুনিককালে সরকারী হুকুমনামায় সংস্কৃত শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সূচী থেকে এক প্রকার নির্বাসন দিয়েছে। আবার ইংরাজী শিক্ষা সমাজের অবহেলিত ও আপামর জনসাধারণ যাতে না পেতে পারে ও শিক্ষার মানে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে, এই মানসে সরকারী হুকুমনামা জারী করে, প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষাকে নির্বাসিত করেছে। এর ফলস্বরূপ দেশের মধ্যে এক নবজাগরণ দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজীতে শিক্ষাদানের জন্য শহরে ও শহরাঞ্চলে একাধিক ইংরাজীমাধ্যমের বিদ্যালয় বা কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। যদিও খরচবহুল এই শিক্ষাধারাকে, আপামর জনসাধারণ গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছে না, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তিরা নিজের সন্তানদের ইংরাজী ভাষার শিক্ষাদানে এগিয়ে চলছে। কারণ বিভিন্ন সরকারী কার্যে এখনও ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট সমাদর রয়েছে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানহীন যুবকেরা অপাংক্তেয়। ফলে নার্সারী বা কিন্ডারগার্টেনের প্রভাবে সমর্থ অভিভাবকেরা সৃষ্টির নিশ্বাস ফেলতে পারছে। আর বাকী জনসাধারণ, তাদের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও অর্থাভাবে এই প্রকারের জ্ঞান অর্জন থেকে, বিচ্যুত হয়ে পড়েছে ও হতাশায় ভুগছে।

প্রয়োজনের তাগিদে অনেকে ফার্সি-ভাষা শিক্ষা করে নবাব দরবারে বিভিন্ন প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত হয় ও পরে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিকানা হস্তগত করে। আবার ইংরাজদের রাজত্বকালে অনেক সরকারী কর্মচারীও সম্পন্ন পরিবার - ইংরাজদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মোসাহেবী করতে এগিয়ে আসে। এদের অনেকে সরকারী নিলামের সুযোগে বা অন্য কোনও উপায়ে জমিদারী স্বত্ত্ব অথবা প্রচুর ভূ-সম্পত্তির (জোৎদারীর) সুত্ত লাভ করেছে। এই সমস্ত কারণেও মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের একটা

অংশকে জমিদার বা জোৎদার শ্রেণীতে দেখা যায়। এযে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী যুগে, সমাজের বুকে ধীরে ধীরে আর একটা বিপর্য্যয় দেখা দেয়। স্বাধীন সরকার আইন প্রনয়ন করে জমিদার, জোৎদার ও ভূস্বামীদের গর্ব খর্ব করে দেয়। প্রবর্ত্তিত আইন অনুসারে এক পরিবার প্রতি জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করে, অতিরিক্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। বর্ত্তমানে অনেক পরিবারের ভরণপোষণ আর চলে না। আবার দিন দিন পরিবার পিছু সংখ্যা বৃদ্ধির চাপও দেখা দেয়, ফলে প্রত্যেক পরিবার বহুধা বিভক্ত হয়ে, অনেক ছোট পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে - অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়, ব্রাহ্মণদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একটু বেশী। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধার্থে এবং কোন চাকরী না পাওয়ায় অনেককে আবার জাতীয় পুরাতন বৃত্তি 'পুরোহিতী' করতে দেখা যাচ্ছে। তবে নিজেরা কৃচ্ছসাধন করে অন্নের সংস্থান করলেও, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর প্রতি আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। শিক্ষিত ছেলেরা, পুরোহিতী বৃত্তিকে উঞ্ছবৃত্তি হিসাবেই গণ্য করে। খোঁজ করে দেখা যাচ্ছে যে - অনেক পরিবারে দুবেলা পেট ভরা অন্ন জোটে না - কিন্তু সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি সযত্নে নজর রাখছে ও যে কোনও উপায়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই সম্প্রদায়ের আরও একটা অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ পুরোহিত পেশায় নিযুক্ত রয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে - বর্ত্তমানে পুরোহিত বৃত্তির স্থায়ী পেশায় নিযুক্ত রয়েছে শতকরা একজন ( ১ )। অবশ্য ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে অনেক বেকার ব্রাহ্মণ যুবকেরা, বাজার থেকে বইপত্তর(পূজার) কিনে সাময়িকভাবে পুরোহিত বৃত্তি অবলম্বন করেছে। পুরোহিত বৃত্তি থেকে সরে আসার মূল কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে - পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দিন উপবাস থেকে

পূজা-অর্চনা করে, কিন্তু তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক (দক্ষিণা) ঠিকমত পায় না। এতে সারাদিন এই কর্মের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থেকে যা দক্ষিণা পায়, তাতে সংসার খরচ নির্বাহ করা কঠিন। ফলে কষ্টের বা শ্রমের তুলনায় আয় কম হওয়ায়, বাধ্য হয়েই অন্য বৃত্তিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হচ্ছে। চাকুরী না পাওয়া লোকেরা অন্য কোনও পেশা বা ব্যবসা গ্রহণ করেছে।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মৈথিলী সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যাবৎ মালদহে বসবাস করে আসছে, তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে এখনও পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছে। মালদহে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশায় বিভিন্ন সমাজের ভাবধারা এই সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা আজ নিজেদের ভাষা অর্থাৎ মৈথিলী ভাষার প্রতি আগেকার মত, আর আকৃষ্ট নয়। এই ভাষা একমাত্র পারিবারিক অথবা নিজেদের আলাপ আলোচনার মধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যম, লেখার ভাষা অথবা বাহিরে ব্যবহৃত যে ভাষা, তা হচ্ছে বাংলা। এমন অনেক পরিবার আছে, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এগিয়েছে, তাদের মধ্যে ব্যবহারিক ভাবেও মৈথিলী ভাষার ব্যবহার নির্বাসিত হয়েছে। এককালে বাংলা ভাষা ছিল মৈথিলী সম্প্রদায়ের কাছে বিলাসিতার ভাষা। কালের পরিবর্তনে বাংলা ভাষা এখন সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আর মূল যে মৈথিলী ভাষা তাই হয়ে পড়েছে বিলাসিতার ভাষা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তঃ দেখা যাবে যে এই বাংলা ভাষাই সমাজের বুকে একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলার বুকে মৈথিলী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার মান অনেক উচ্চ। আবার এই সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অপেক্ষা বাঙ্গালীদের ধর্মাচরণ পদ্ধতি অনেক সহজতর। ফলে সমাজের বুকে সকলেই চায় সহজকে, তাই দেখা যাচ্ছে কিছু মৈথিলী ও কিছু বাঙ্গালী - পাঁচমেশালী ধর্মীয় মনোভাব সমাজে প্রবেশ করছে। নিজেদের সনাতন ধর্মকে ত্যাগ করে নূতন ভাবধারা

প্রবেশ করানোর একটা আকুল আগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু বিবেকের দংশনে একেবারে প্রবাহিত ধর্মীয় কৃষ্টিকে পরিত্যাগ করতে পারছে না। বৃত্তিগত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে মালদহে বসবাসকারীরা মৈথিলীদের মধ্যে - শিক্ষকতার স্থান প্রথম। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সুরাষ্ট্র বা পুলিশ বিভাগে চাকুরিয়ারা, এছাড়া বিভিন্ন প্রকার সরকারী ও বেসরকারী কর্মে অনেকে নিযুক্ত রয়েছে।

মালদহে বসবাসকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-আচরণ, উৎসব, পাল-পার্বণ, প্রভৃতি এখনও অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের কৃষ্টিকে মেনে চলছে। এখানে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ের পূর্ব-পুরুষেরা মিথিলার অধিবাসী। কৌশীনদ মিথিলার প্রধান নদী। গঙ্গার সঙ্গে এই নদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রাচীনকালে আর্য্য বলে অভিহিত। আর্য্যজাতি প্রধানতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত ত্রিয়ানুষ্ঠানে তারা রত ও অভিজ্ঞ। অন্তঃপুরে নারীরাও সমানভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি, সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে এসেছে। সামাজিক কৃষ্টির ধারাকে কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব বা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেনি। মিথিলার ব্রাহ্মণ পরিবার রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে স্থানান্তরিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করলেও, এককভাবে মালদহের ন্যায় অন্যত্র বৃহত্তম সমাজ গঠন করতে পারেনি। মৈথিলী পরিবারের ব্রতোৎসব সম্মুখে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা গেল -

" ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্মুখ কোন আকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে, অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। ঋগ্বেদীয় আর্য্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী, যজ্ঞধর্মী আর্য্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারাই হয়ত: ছিলেন ব্রাত্য।

এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশী। ব্রত-কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বোধ হয় (বৃ ধাতু + ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা। নির্বাচন করতে ব্রতের উদ্দেশ্য বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়, এই সীমা রেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী আচার প্রচলিত - যেমন নূতন বরের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙ্গুল নানাভঙ্গীতে ঘুরানোর, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে, কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ - তাহার ভিতরেও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের উদ্দেশ্যও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী আচারগুলি লক্ষ্য করলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায় এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ তথ্যও লক্ষণীয়। এই ম্যাজিক বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্য্যদের চোখে ছিলেন ব্রাত্য।[১০]

বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম বৈদিকমতে সম্পন্ন করা হয়। সগোত্রে বা সমগোত্রে কখনও বিবাহ হয় না। কারণ, সগোত্র কথাটির অর্থ একই পিতার বংশধারা। ফলে হিন্দু বিবাহ নিয়ম অনুসারে ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই বিবাহ অনুষ্ঠান বেদের নির্দেশ অনুযায়ী কার্যকরী করা হয়। বেদ চার

---

১০. রায় নীহার রঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মরণী ভবন, ৩০, পটুয়াটোলালেন, কলি-৯, ১৯৮০ (৮।৯।৮০), তৃতীয় সংস্করণ পৃ.৬১৩

ভাগে বিভক্ত - ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋকবেদের অর্থ খুব জটীল মনে হওয়ায় তদানীন্তন পন্ডিত বা ঋষিগণ সরলভাবে যজুর্বেদ রচনা করেন। ইহা ঋকবেদেরই সরলীকরণ সংকলন। আবার যজুর্বেদকে সরলীকরণ করে রচনা করা হয় সামবেদ। সামবেদকে সামগানও বলা হয়। সামবেদ থেকে রচিত হয় অথর্ববেদ। প্রধানত মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে যজুর্বেদ ও সামবেদ - দুটিই - প্রচলিত আছে। পঞ্জিকায় লগ্নবিচারে দেখান হয় যজুর্বেদী বিবাহ ও সামবেদী বিবাহ এর নির্ঘন্ট। এখনও মালদহে বসবাসকারী মৈথিলীরা দ্বারভাঙ্গায় রচিত মৈথিলী পঞ্জিকা বা পঞ্জিকা মতেই বিবাহের ও উপনয়নের দিন-ক্ষন নির্দ্ধারণ করে থাকে। বাংলায় বহুল প্রচারিত পি·এম·বাক্চির পঞ্জিকার গণনা অনেকটা মৈথিলী পঞ্জিকার সঙ্গে মিলে যায়। বর্ত্তমানে, মোটামুটিভাবে পি·এম· বাক্চির পঞ্জিকার মতকেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-উপনয়ণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। এই বিচার কতক নিয়মবিধি মেনে করতে হয়, যার প্রধান হল গোত্র বিচার।

মালদহ জেলায় মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গোত্রীয় বংশ ধারাকে পাওয়া যায়, যথা - (১) বাৎস্যগোত্র, (২) সাবর্ণগোত্র, (৩) শান্ডিল্য গোত্র, (৪) কাশ্যপ গোত্র, (৫) পরাশর গোত্র, (৬) ভরদ্বাজ গোত্র এবং (৭) বিষ্ণুবৃদ্ধি গোত্র, প্রভৃতি। সগোত্র অর্থাৎ একই গোত্রের অন্তর্গত কোনও ছেলে বা মেয়ের বিবাহ হয় না। এক গোত্রের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে অন্য গোত্রের ছেলে বা মেয়ের বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু একমাত্র বাৎসগোত্র ও সাবর্ণগোত্রের কোনও ছেলে বা মেয়ের বিবাহ হবে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভাবে গোত্রের নির্দেশ থাকলেও উভয়ে যমজ। আবার অনেক পন্ডিতের মতে উভয়ে একই পিতার ঔরসে ভিন্ন মায়ের গর্ভে জাত সন্তান। আমরা বেদে বিভিন্ন ঋষির নাম পাই। এই সমস্ত ঋষিদের বংশধারাকে

পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই 'গোত্র' কথাটির উদ্ভব হয়েছে। যেমন একই পিতার সন্তানদের মধ্যে কোনও বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, তেমনি একই বংশধারার মধ্যেও কোনও বিবাহ-কর্ম হবে না। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে, বর্তমানে অনেকে এইপ্রকার নিয়মবিধিকে কুসংস্কার বলে অভিহিত করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারা যায় যে - বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং পরীক্ষার দ্বারাই সঠিক গ্রুপের রক্তের সঞ্চার ঘটান হয়ে থাকে, তেমনি সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসও সেই গ্রুপের মতই বহুল পরীক্ষিত। আর এটাকে অমান্য করার ফল অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে - খুব মারাত্মক। সগোত্রে বিবাহের পরিণতি নানাভাবে অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে ও খুব দুঃখজনক হয়। এইরূপ বিবাহকে অসবর্ণ বিবাহ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

বিবাহ বাসরে শালগ্রাম (নারায়ণ) শিলা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজা করা হয়। পরে যজ্ঞস্থলী নির্মাণ করে, তাতে যজ্ঞকাষ্ঠ (বিশেষ করে আম, যজ্ঞডুমুর, বেল, প্রভৃতি) স্থাপন করে, শুদ্ধভাবে কাঁসার থালায় আগুন নিয়ে এসে, সেই যজ্ঞস্থলীতে দেওয়া হয়। পরে বৈদিক আচারে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ব্রহ্মাকে পূজা করা হয়। এই জ্বলন্ত ব্রহ্মাকে এবং নারায়ণ শিলাকে সাক্ষী রেখে ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ বর-কনে বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর-কনের গিঁট বন্ধন অর্থাৎ বরের চাদরের প্রান্ত দেশের সঙ্গে মেয়ের কাপড়ের প্রান্তদেশের গিঁট বা গেড়ো দেওয়া হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহাকেই সপ্তপদী বলে। সপ্তপদী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে পিতৃগোত্র থেকে বিচ্যুৎ হয়ে স্বামীর গোত্রে প্রবেশ করে। ফলে পিতৃবংশের অধিকার, যা জন্মের পর থেকেই, পেয়ে আসছিল তার শেষ হল-এই সপ্তপদীতে, আর স্বামীর বংশে তার স্থান লাভ ঘটল।

পরে গোত্র অনুসারে (বরের গোত্র) ৩ বা ৪ রাত্রির পর চতুর্থীকর্ম যথাস্থানে বাসি বিয়ে, ফেরা বিয়ে, পুনরায় যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিয়ে ও পুরোহিত কর্তৃক উচ্চারিত বেদমন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা বাসি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে একমাত্র পুরোহিতের বেদোক্ত মন্ত্রের উচ্চারণই মূল নয়, অনেক প্রকার স্ত্রী-আচারও অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাই বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত।

উপনয়ন (পৈতা) ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট শুভ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ সন্তান দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট একটা বয়ঃসীমা স্থির করা আছে। নীচে ৮ বৎসর বয়স ও উর্দ্ধে ১৪ বৎসর বয়সকালই উপনয়নের উৎকৃষ্ট বয়স। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ১৪ বৎসর বা ১৫ বৎসর বয়সেও উপনয়ন দিতে দেখা যায়। কিন্তু এই বয়স পার হয়ে গেলে পর, প্রায়শ্চিত্ত করে তবে উপনয়ন দিতে হয়। কোনও অভিভাবকই এই ঝুঁকি নেয় না। উপনয়নের ক্ষেত্রে বেদোক্ত বিধি-বিধান কঠোর নিয়মে পালন করা হয়। সাধারণত বালকাবস্থায়ই উপনয়ন অনুষ্ঠানের উৎকৃষ্ট সময়। অনেক প্রকারের সামাজিক নিয়মবিধি পালন করতে দেখা যায়। এই সময়ে বালকদেরকে শাস্ত্রীয় নাম 'বরুয়া' বলে অভিহিত করা হয়। বরুয়াকে পূর্বদিন বৈকালে বাদ্যসহকারে ও ত্রয়োদের সমভিব্যহারে নদীর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সূর্যদেবের অস্তগমন সময়ে জলশোধন পৃথ্বীপূজা, প্রভৃতি কর্ম সম্পন্ন করা হয় ও পুনরায় বাড়ী ফিরে আসে। সন্ধ্যায় বরুয়া বা ছেলের মা-বাবা অভাবে সস্ত্রীক কোনও নিকট আত্মীয় বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা, নির্দিষ্ট বাসর ঘরে বসে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, জুটিকা বন্ধন, প্রভৃতি গৃহ্য কর্ম সম্পাদন করা হয়। ষোড়শ মাতৃকা পূজা করা হয় ও বাসরে এবং গৃহের দরজায় ঘি দিয়ে বসুধারা দেওয়া হয়। এই বাসরে বরুয়া ৩।৪ দিন ধরে বাস করবে।

পরদিন উঠানে বা আঙিনায় বেদী তৈরী করা হয় ও সেই বেদীতে বর্‌য়াকে উপনয়ন অনুষ্ঠানের জন্য উপবেশন করানো হয়। পূর্ব নির্ধারিত বিবাহিত কোনও পিতৃব্যস্থানীয় আত্মীয়কে গুরু রূপে বর্‌য়ার পাশে বসানো হয়। এই গুরুকে আচার্য্য বলা হয়। আচার্য্য পুরোহিত কর্তৃক উচ্চারিত বেদোক্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করে উপনয়ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। অপর এক সম্পর্কিত ব্যক্তিকে ব্রহ্মারূপে বেদীতে বরণ করা হয়, যার মূল কর্ম হল বেদীর কেন্দ্রে ব্রহ্মা বা আগুন জ্বালানো এবং অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মাকে প্রজ্বলিত রাখা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিকট আত্মীয়-বর্গকে হলুদ রাঙা বা রঙীন বস্ত্রে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠান কর্মে-নিযুক্ত পুরোহিত আচার্য্য, ব্রহ্মা, নাপিত, প্রত্যেকে রঙীন কাপড়ে ভূষিত হয়ে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠান চিত্তাকর্ষক হয় ও সমগ্র পরিবেশ এক ধর্মীয় মর্য্যাদায় পরিপূর্ণ হয়। বাদ্য সহকারে ও বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণে বৈদিক যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয়। উপস্থিত আত্মীয় পরিজন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা শুভ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'মুণ্ডন'। অনুষ্ঠাণ শেষে, শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে, বর্‌য়া ৩ বা ৪ দিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে, নির্দিষ্ট বাসরে অবস্থান করে। ৩।৪ দিন অতীত হলে পর পুনরায় একটি অনুষ্ঠান করা হয় - এটাকে চতুর্থী কর্ম বলে। চতুর্থী কর্মের দ্বারা বর্‌য়ার ব্রহ্মচর্য্যের সমাধান ঘটে। সেইদিন দুপুরে পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বর্‌য়াকে বসিয়ে পংক্তি ভোজন করান হয়। তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রতি পদক্ষেপ মৈথিলী মতে এবং বেদোক্ত নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করা হয়। দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন মঙ্গলাচরণ, স্ত্রী আচার ও বেদোক্ত নিয়মে সম্পন্ন করা হয়।

উপনয়ন অনুষ্ঠানে আচার্য্য প্রদত্ত ওঁ ভূঃ ভুবঃ ... বীজমন্ত্র প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্যই জপ করা উচিৎ। এই বীজমন্ত্রের শক্তি অসীম এবং আধ্যাত্মিক শক্তি জাগায়,আর এই মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রকার বাধা জয় করার প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্যয়বহুল ও আনন্দবহুল এবং নানারকম ক্রিয়া-কর্মের ঝামেলা সহ্য করে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ সমাজ এইরূপ অনুষ্ঠান পালন করার আর পক্ষপাতী নয়। দিনে দিনে এই সম্প্রদায় ধর্ম-বিমুখ হয়ে পড়ছে। অবশ্য বাহ্যিকভাবে আগ্রহ দেখাতে ত্রুটি করেনা। নিজেরা যেটা পালন করতে বিমুখ হয়েছে, অন্যের পালিত অনুষ্ঠানে যাতঘরি তারাই বেশী করে। অনেকে আবার মূল্যবান যজ্ঞোপবীত গলায় ধারণ করাটা পছন্দ করে না। কোনও কার্য্যকারণে বা একান্ত বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করেই আবার যজ্ঞোপবীতকে পরিত্যাগ করে বসে। যারা পুরোহিত বৃত্তিতে নিযুক্ত, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলের যজুর্বেদ বা সামবেদের বিভাগ সমূহে সম্যক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান অনুষ্ঠানগুলি জগা-খিচুড়ী দশা প্রাপ্ত হয়।

বিবাহ, উপনয়ন ছাড়াও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান বেদোক্ত নিয়মে প্রতিপালিত হয়। মৈথিল সমাজের পরিচিত ও সর্বজন বন্দিত মান্যবর পন্ডিত, দ্বারভাঙ্গা জেলার বীরপার্হ গ্রাম নিবাসী ও বর্ত্তমানে নসীপুর (মুর্শিদাবাদ) নিবাসী এবং জিয়াগঞ্জ স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রী শ্যামসুন্দর মিশ্র,ছন্দোগ্য ও বাজসনেয়ী মতে অনুষ্ঠিত বিবাহ, উপনয়ন এবং আদ্যশ্রাদ্ধ পুস্তক পৃথক্‌ভাবে রচনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকগুলি অনুসরণ করলে হয়তঃ এই প্রকার ভুল সংশোধিত হতে পারে। এটা সমাজের প্রতি কোনও নির্দেশ নয়, শুধু নিজেদের ভুল সংশোধনের জন্য অনুরোধ মাত্র। প্রকাশ থাকে যে শ্যামসুন্দর মিশ্র মানদহের মৈথিল সমাজে গুরুদেব বলেই বিশেষ পরিচিত।

মানদহে বসবাসকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের নারীরা বিভিন্ন প্রকার ব্রতানুষ্ঠান পালন করে চলেছে। নিজেদের সমাজের প্রাচীন কৃষ্টিকে আজ পর্য্যন্ত পরম নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছে। যদিও এর মধ্যে, একসঙ্গে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের পালিত কিছু ব্রতপার্বণ এই সমাজে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের অনুষ্ঠিত ব্রতাচার, আচরণ, পদ্ধতি প্রভৃতি এই সমাজের অনেক নারীরা পালন করতে শুরু করেছে। ফলে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পালনে একটা মিশ্র প্রক্রিয়া রূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে - এই সমাজের নারীদের একটা আত্মবিশ্বাস, এই সমস্ত ব্রতানুষ্ঠান, আলপনা, মঙ্গলাচরণ, ইত্যাদিতে একটা গুহ্য শক্তি বিরাজ করছে। অবশ্য সত্যনিষ্ঠা, সতীত্ব, হিতৈষণা ইত্যাদি কর্মের যে প্রেরণা ও তার সুফল লাভের সদিচ্ছার প্রেরণা যুগিয়েছে। কিছুটা প্রাচীন কৃষ্টিয় ধারা এবং বহুলভাবে অনুসরণ করা হয়। রামায়ন, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ, প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্র। ফলে গুহ্যশক্তি প্রকারান্তরে ম্যাজিক বিশ্বাসী এই যে ব্রতধর্ম ও ব্রতধর্ম-আচরণকারী ব্রতচারীরা ঋগ্বেদীয় আর্য্যদের চোখে ছিল ব্রাত্য। এই সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

" আর্য্য সভ্যতার পূর্বে অনার্য্যজাতি- নিজেদের সমাজ ব্যবস্থায় নানা প্রকার ব্রতানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিত। আর্য্য সমাজ তথা ব্রাহ্মণ্য জাতি এদেশে অবস্থান করত: আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, যখন বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, প্রভৃতি রচিত হইতেছিল। প্রাক্ আর্য্য ও অনার্য্য নর-নারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নায়। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহু অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এইভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি লাভ

করিয়াছে; আজও করিতেছে। পূর্বে এই সমস্ত পূজাপার্বন মেয়েরাই করিয়া লইত। ক্রমে এই সমস্ত পূজার নিমিত্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইভাবে ব্রহ্মণ্য সমাজ ইহার স্বীকৃতি দান করে। ক্রমান্বয়ে কৃষিভিত্তিক এই বাংলাদেশে ও বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্মে এই সব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান দখল করে।[১১]

মৈথিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত ব্রতানুষ্ঠান বর্ত্তমানে আচরিত হচ্ছে, তার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত ছাড়াও যে সমস্ত মৈথিলী মালদহ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন, তাঁরা ক্রমেই - বাঙ্গালী হয়ে পড়ছেন। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মাতৃভাষাকে ভুলে যেতে বসেছেন। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে মালদহের জীবনস্রোতে নিজেদেরকে একীভূত করার একটা উদ্যম দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার মূল মাধ্যম বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করে বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এই সঙ্গে অন্যান্য ভাষায়ও জ্ঞানলাভ করেছে। নিজেদের কৃষ্টিকে বাংলার কৃষ্টির তথা মালদহের কৃষ্টির সঙ্গে একীভূত করে ফেলেছে। তবুও এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে সবকিছুর সঙ্গে মিল রেখেও, নিজেদের কৃষ্টিকে রক্ষা করে চলেছে। একদিকে যেমন মালদহের জীবনস্রোতে নিজেদেরকে চালিয়ে রেখেছে, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে একটি বিশিষ্ট ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিদগ্ধজনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে - তাঁরা নিজেদের তথা এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার গবেষনামূলক তথ্য রেখে যান নায়। যদিও ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি কালেভদ্রে আলোচনা বা সমালোচনা, স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বা কোনও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সামগ্রিকভাবে

---

১১. তদেব - পৃ.৭২৯

এই সম্প্রদায়কে জানবার কোনও উপায় নেই। সেই কারণে, এই দিক লক্ষ্য রেখে, বর্ত্তমান গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অতঃপর, এর সূত্র ধরে পরবর্ত্তী আলোচনা নিম্নোক্ত পর্য্যায় অবলম্বনে বিধৃত হবে।

## প্রথম অধ্যায় :

**মৈথিল সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত :-** এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকজন মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে কিভাবে বসবাস করে আসছে। এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা, জীবিকা, পেশা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। এককথায় বলা যায় মূল ভূখণ্ড মিথিলা থেকে আগত এই সম্প্রদায়ের লোকজন বর্ত্তমানে কি অবস্থায় রয়েছেন, তার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক এবং এই বিবরণের ভিত্তিতেই পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির আলোচনা অগ্রসর হবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায় :

**মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষা :-** মৈথিল অঞ্চলের মূল ভাষাকে এক ধরণের মার্জিত হিন্দী ভাষা বলা যেতে পারে। মধ্যযুগ থেকেই মিথিলার সঙ্গে, বিভিন্ন কারণে, বাংলার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রেই মৈথিলী ভাষাভাষীরা প্রাচীন গৌড় বা মালদহ জেলায় আগমন করে। ভৌগলিক দিক থেকে যেহেতু মালদহ জেলা বিহারের প্রান্তবর্ত্তী এবং মিথিলার খুব নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ড সেই জন্যেই মিথিলা থেকে আগত মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন একটি ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা

ভেবেছেন। একথা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বাভাবিক কারণেই মালদহ জেলার ভাষার সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের ভাষাভাষীদের যোগাযোগের ফলে এক ধরণের একটি মিশ্র কথ্য রীতির উদ্ভব ঘটে। মালদহ যেহেতু একটি বহু কথ্য ভাষার সমন্বয়ে গড়ে উঠা অঞ্চল সেই জন্যই আমরা লক্ষ্য করতে পারি বিভিন্ন কথ্য ভাষা কোনও না কোনও ভাবে পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত। স্বাভাবিক কারণেই মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁদের মূল মাতৃভাষার সঙ্গে এইসব প্রভাবকে গ্রহন করে নিয়েছেন। বিশেষভাবে যদি সাম্প্রতিক কালের কথা ভাবা যায় তাহলে দেখব এই সম্প্রদায়ের যাঁরা শিক্ষিত মানুষ তাঁরা সামাজিকভাবে চলতি বাংলাকে কথ্য ভাষা হিসাবে গ্রহন করেছেন অথচ তাঁদের কথ্য ভাষা পুরোপুরি চলতি বাংলাও নয়। বস্তুতঃ মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষাভাষীরা যে কথ্য ভাষায় অভ্যস্ত তার একটি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে মালদহে কথ্য ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা হচ্ছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ মালদহের কথ্য ভাষার উপর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। এই সব আলোচনার মূল্য স্বীকার করেও বলা যায় এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে মৈথিল ভাষাভাষীদের কথ্য ভাষা সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি।

ভাষা বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করে এই কথ্য ভাষার রূপ ও রং তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্যই এই অধ্যায়টির অবতারণা করা হয়েছে। এই আলোচনা মূলতঃ ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক থেকে বিধৃত হবে।

এই গবেষনা কাজে মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষাগত আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে ভাষা প্রকৃতপক্ষে যে কোন সম্প্রদায়ের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মূলতঃ এই কারণেই এই রকম একটি ভাষাভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

## তৃতীয় অধ্যায় :

**মৈথিল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি :-** পূর্বাপরতা সূত্রে অতঃপর মৈথিলী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত আলোচনা করাই এই অধ্যায়টির লক্ষ্য। মৈথিল সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বন, জীবন যাত্রার প্রণালী, বিবাহ, উপনয়ন, ইত্যাদির সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, তাঁদের বিভিন্ন উৎসব এবং লোকগাথা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়টিতে।

এই আলোচনার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব, বহু শতাব্দী অতিক্রম করেও কিভাবে এই সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। একই সঙ্গে এও দেখতে চেষ্টা করব কিভাবে তাঁরা এই জেলার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও অর্থাৎ মালদহ জেলার জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের মেলানো সত্ত্বেও তাঁরা কিভাবে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি পরিপোষন করে চলেছেন।

## চতুর্থ অধ্যায়:

**মৈথিল ভাষাভাষীদের সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের বিবরণ :-** তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্র ধরে এই অধ্যায়টির লক্ষ্য হবে মৈথিল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লোকগাথা - লোকগীতি - ছড়া ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি নির্বাচিত সংকলন তুলে ধরা এবং পর্য্যালোচনা করা।

## পঞ্চম অধ্যায় :

**উপসংহার :** পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনা সূত্রে সবশেষে দেখতে চেষ্টা করব, মৈথিলী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট কি কি এবং মালদহের সংস্কৃতিতে

কোথায় তাদের বিশিষ্ট অবদান রয়ে গেছে। একই সঙ্গে আমরা দেখতে চেষ্টা করব বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত সমাজ ব্যবস্থায় এই সম্প্রদায়ের লোকজন কিভাবে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। এক কথায় বলা যায় - মালদহে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈথিল সম্প্রদায়ের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত যে অনন্যতা রয়েছে তার মূল্যায়ন করাই হবে এই "উপসংহারের" উপজীব্য।

**********|| X ||**********